মহাযুদ্ধের ইতিহাস

প্রকাশক—

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী এম্-এ, বি-এল,

বরদা এজেন্সী,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

পুস্তক সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা ২৭।

আশ্বিন, ১৩৩৩

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস,

শ্রী ত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক

২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকা

দাম দুই টাকা আট আনা

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—বরদা এজেন্সী—
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

—বঙ্কিমচন্দ্রের—

আনন্দমঠ

(১১শ রাজ সংস্করণ)

দুই টাকা

—মণীন্দ্রলাল বসুর—

রক্তকমল	১৷৷/০
সোনার হরিণ	১৷৷/০
মায়াপুরী	১৷৷০

—হেমেন্দ্রলাল রায়ের—

ঝড়ের দোলা

এক টাকা বারো আনা

—যতীন্দ্রমোহন সিংহের—

উড়িষ্যার চিত্র (৩য় সংস্করণ)

দুই টাকা

মামার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে-

এই উপন্যাসখানি 'কালি-কলম' মাসিক
সাহিত্য-পত্রে ধারাবাহিকভাবে
প্রকাশিত হইয়াছিল।

—এই লেখকের লেখা—

অতসী	১৸৹
ষোল-আনা	১৸৹
মাটির ঘর	২৲
ঝড়ো-হাওয়া	২৲
বাংলার মেয়ে	২৲
জোয়ার-ভাটা	২৷৹

কয়লা-কুঠি

বহুবচন

নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

—পাঁক—

এক টাকা বারো আনা

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

শহরের কাছাকাছি, অথচ শহর নয়। পাঁচ-সাতটা গোলদারি দোকান চলে। গ্রামখানি বড়।

ধরম্‌তলায় তরি-তরকারির হাট বসে। ভিন্ন গ্রাম হইতে চাষার মেয়েরা মাথায় মোট লইয়া মরসুমি ফসল বিক্রি করিতে আসে। কিন্তু সম্প্রতি তাহারা আর আসিতে চায় না। গাঁয়ের কয়েক্‌টা ছোক্‌রা নাকি ভারি বজ্জাত।

মেয়েদের আসা বন্ধ হইয়াছে।—পুরুষেরা আসে।

কার্ত্তিক মাস। মাঠের নূতন বেগুন হাটে আসিয়াছিল।

খবর পাইয়া গণেশ পাঁড়ে সেদিন নিজেই হাট করিতে গেল।

বেগুন-ওয়ালাকে দেখাই যায় না। গাঁয়ের মেয়েরা তখন তাহাকে তাহার ঝুড়ি-সমেত ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গণেশ তাহার গোঁ[illegible]টা একবার চুম্‌রাইয়া লইয়া জোর-গলায় হাঁকি[illegible] কত—দর কত হে বেগুনের?"

জবাব আসিল না,—সম্ভবত গোলমালে সে শুনিতে পায় নাই।

"দেমাগ দেখ চাষার! আরে—এই!"

চাষা মুখ তুলিয়া চাহিল।

"দর কত?—বেগুন?"

"তিন আনা ঠাকুর, তিন আনা সের!— ওগো, ওঠ ঠাকরুণ, ওঠ তুমি। ফাউ পায় না, তিনটি বেগুনের ফাউ নাই।"

গণেশ বলিল, "তিন আনা কি,—তিন আনা কি আবার? সোনা-রূপো নয়—মাঠের বেগুন।"

অন্য খরিদ্দারের বেগুন ওজন করিতেছিল, ঘাড়

নাড়িয়া চাষা বলিল, "হাঁ বাবু, তিন আনা। যুদ্ধুর বাজার আজকাল। ঝিঞের দরুণ সেদিনকার সেই চার-আনা পাব তোমার কাছে।"

"পাবি ত' কি পালিয়ে গেল নাকি রে হারামজাদা, চাষা!"

"গাল দি‹ ... ,গাল দিও না ঠাকুর। গরীব লোক, আমাদের ... ফেলে দাও।"

কথাটা সে একটুখানি অপ্রিয়ভাবেই বলিয়া ফেলিল।

"আমার দুয়োরে এসে' আবার আমাকেই জোর দেখ বেটার!"—গণেশ পাঁড়ে অগ্রসর হইয়া গিয়া ঠাস্ করিয়া গালে তাহার এক চড় বসাইয়া দিল।—"ভাগ্, শালা, ভাগ!"

"মার্‌বে নাকি তুমি?"—বলিয়া বুক ফুলাইয়া চাষাও উঠিয়া দাঁড়াইল।

কনৌজ ব্রাহ্মণ,—বহুদিন বাংলায় বাস করিয়া না হয় বাঙ্গালীই হইয়া গেছে! গণেশ পাঁড়ের বুকখানাও কম চওড়া নয়। লাথি মারিয়া বেগুনের ঝুড়িটা সে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল।

লুট-করা মাল কুড়াইয়া লইবার লোকের অভাব সেখানে ছিল না। মিনিটকয়েকের মধ্যে যে যাহা পাইল কুড়াইয়া লইল। গণেশ পাঁড়ে চালাক লোক। বচসা করিল, হাঙ্গামা করিল, লোকটাকে হাতের সুখে ঘা-কতক বসাইয়াও দিল, মাল লুট করিল, আবার সকলের সঙ্গে নিজেও এক আঁচল বেগুন কুড়াইয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

চাষা মার খাইয়া কাঁদিতেছিল; দশজনকে শুনাইয়া বলিল, "জমিদারের কাছে যাই—এর বিচের হোক্।"

কে একজন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, জমিদারের কাছে গিয়া কোনও লাভ নাই। গণেশ পাঁড়ে ভয়ানক লোক।

—ধরম্‌তলার হাট আর বসে না।

গ্রামের দক্ষিণে রেল-ষ্টেশন। দু'তিনটা বড় বড় কল-কারখানাও বসিল। হাট-বাজার দোকান-দানি

লোকজনের বাস-বস্তিতে জায়গাটা দিনে-দিনে বেশ জমকালো রকমের হইয়া উঠিতেছে। গাঁয়ের দক্ষিণ তরফ্‌টা ঘিরিয়া লইতে আর বেশি দেরি নাই।

পূব, পশ্চিম আর উত্তর,—এই তিনটা দিক এখনও ফাঁকা। চাষ-আবাদের জায়গা-জমিও বিস্তর। পশ্চিমে ছোট একটি নদীও আছে। কিন্তু পাকা ধান একবার ঘরে ঢুকিলে সেদিকে আর কেহ ফিরিয়াও তাকায় না, খোরাক্‌ বাদে অবশিষ্ট ধান-চাল শহরে বিক্রি করিয়া আসে,—জামা কেনে, জুতা কেনে, চুরুট ফুঁকে, মদ খায়, গাঁজা টানে,—নিতান্ত অভাব হইলে কল-কারখানায় সাড়ে বত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়া ফিটার্‌ মিস্ত্রির কাজ শিখিতে যায়। এ-গ্রাম হইতে তিনজন গিয়াছে, কিন্তু সেই তিনজনেই তিনজন।

—"আগে তিন ছিলুম্‌ গাঁজায় ভূত, চার ছিলুম টানে কার বাবার সাধ্যি, আর এখন,—তিন ছিলুমই টানো, আর তিন-তিরিক্ষে ন' ছিলুমই টানো বাছাধন, দেখতে-না-দেখতে নেশা হয়ে যাবে—ঠাণ্ডা জল। শালা লোহা-

লক্কড়ের এমনি বিছ্‌ছিরি শব্দ······দু-আনা রোজগার কর্‌তে গিয়ে চার আনাই মাটি।"

কাজ হইতে ফিরিয়া মনু পৈতণ্ডি সেদিন ইহাই বলিল। কথাটা শুনিয়া অবধি অনেকের উৎসাহ কমিয়া গেছে, এবং ইহার পরেও যে এ-গ্রাম হইতে আর কেহ সেখানে বেকুব্ বনিতে যাইবে—তাহার আশা-ভরসা খুবই কম। তবে সুসংবাদের মধ্যে এই যে, পচু গাঙ্গুলি গত বৎসর কালীয়দমনের যাত্রা শুনিতে গিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে যে হারমোনিয়ামখানি গায়ের-কাপড় ঢাকা দিয়া রাতারাতি সরিয়া পড়িয়াছিল, অদ্যাবধি তাহার খোঁজ-খবর কিছু হইল না—ভালই বাজিতেছে; তাহার উপর ক্ষুদু চাটুজ্যের ডুগি-তবলাটি সম্প্রতি মেরামত করানো হইয়াছে, রাখহরি বোরেগীর খঞ্জনি, মন্দিরা—সবই মজুত, এই সব যন্ত্রপাতি থাকিতে গ্রামে একটি যাত্রা কিম্বা থিয়েটারের দল যে কেন চলে না, আজকাল তাহারই পরামর্শ চলিতেছে। বেনোয়ারী ওস্তাদ পরের দলে ঠিকা-চুক্তিতে বেহালা বাজাইয়া বেড়ায়, গ্রামে যাত্রার দল হইলে তাহার ঘর-বার দুই-ই হয়, কাজেই একাজে

তাহারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। এমন-কি, দলটার একটুখানি নাম-ডাক হইয়া পড়িলে রাত-পিছু দু-এক টাকা সকলেই পাইবে,—নেশা-ভাং ত' আছেই।

মহা উৎসাহে ছোক্‌রারা এখন চাঁদা আদায়ের খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

ধরমতলার পাশে মস্ত বড় যে গোলদারি দোকানটি চলে, সেখানে কাগজ-কলম শেলেট্-পেন্সিল ত' আছেই, আজকাল আবার কেমিকেলের গয়না, গেঞ্জি-মোজা, সাবান জরদা—সবই মিলিতেছে। এবং এই সবের চলন্ হওয়াতেই নাকি সজনী ময়রার অন্ধকার খুপ্‌রির উপরেও ইটের দোতলা উঠিল,—এমনি কথা অনেকেই বলাবলি করে। কিন্তু কেনারাম মুখুজ্যে বলে, "না হে না, উঠুক। দোতলা ছেড়ে' তেতলাই উঠুক্ না! কথায় আছে, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে' যাবে,—আর সেই যে কি হে—অতি ছোট হ'য়ো না······। চুরির মাল-বেচা

পয়সা বাবা—এমন তুমিও হতে পার আমিও হতে পারি।”

সেদিন সকালে কেনারাম মুখুজ্যে সেই দিক দিয়াই আসিতেছিল। রোজ দুবেলা তাহাকে এইদিক দিয়া একবার করিয়া আসিতে হয়। আফিংখোর মানুষ,—সকাল-বিকাল একটুখানি চা না হইলে চলে না। অথচ অনেক কষ্টে, তাহাদের দশজনের অনেক বলা-কওয়ার পর, মাত্র এই সেদিন—গত বৎসর পৌষ মাসে, দুরন্ত শীতের এক স্মরণীয় প্রাতঃকালে সজনী দত্তকে এই আফিং-এর অভ্যাসটি ধরানো হইয়াছে। তাহারও চা-চিনির অভাব নাই। দোকানের চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া চির-পুরাতন চটের আসনখানির উপর একবার চাপিয়া বসিতে পারিলে চায়ের বরাদ্দ কাহারও ফাঁক পড়ে না। অন্তত কাঁশার বাটির একবাটি করিয়া মিলিবেই।

কপিল চক্কোত্তি তখন সবেমাত্র তাহার কোঁচার খুঁটের উপর বসাইয়া, গরম কাঁশার বাটিটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে। কি-একটা ব্যারামের জন্য কেনারামের চোখের পাতা দিনরাত মিট্ মিট্ করে, ভাল দেখিতেও

পায় না। কপিলকে সে প্রথমে চিনিতে পারে নাই। বলিল, "কে হে, বদি? চারির জন্যে বিস্কুট আনতে দিলাম সেদিন তোমার ভাই-পোকে। পাঁচ আনায় তিনটি বিস্কুট এনেছে।—বলি, ওহে সজনী, শোন শোন, পাঁচ আনায় তিনটি বিস্কুট, তোমরা দোকানদার মানুষ—শুনেছ কখনও?"

চারিদিকে অগোছালো জিনিষ-পত্রের মাঝখানে বসিয়া সজনী খরিদ্দার বিদায় করিতেছিল। বলিল, "চারুর আবার কি হলো মুখুজ্যে?"

দরজার একপাশে পিতলের একটি ঘটিতে কেনারামের জন্য চা ঢাকা ছিল, বাটির উপর ধীরে-ধীরে চাটুকু ঢালিয়া বলিল, "জ্বর—"

ভিতর হইতে জবাব আসিল, "হুঁ মুখুজ্যে, জ্বর আজকাল সবারই। আমাদেরও চার-পাঁচটা ছেলে লটু-পট করছে।"

কিন্তু একচুমুক চা মুখে দিয়াই কেনারামের মুখখানা কেমন যেন একরকমের হইয়া গেল, বলিল, "সজনী, এ কি

হে, চা যে তোমার ঠাণ্ডা জল! না আছে মিষ্টি না আছে—"

সজনী একটুখানি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই বলিল, "সে কি মুখুজ্যে! ওই যে কপিল-ঠাকুরের চায়ে 'ভাপ্' উঠছে এখনও!"

কপিলের বাটির উপর তখনও ধোঁয়া উঠিতেছিল, কেনারাম তাহা দেখিতে পায় নাই। এইবার ভাল করিয়া তাহার মিট্‌মিটে চোখ দুইটাকে একটুখানি চাড়া দিয়া কেনারাম সেইদিক পানে তাকাইল। বলিল, "কে? কপ্‌লে নাকি? তবে আর বল্‌তে হবে কেন সজনী, শালা ও-পাড়া থেকে এসেছে এই পাড়ায় চা মার্‌তে। দিয়েছে হয়ত আমার চায়ে জল ঢেলে বাড়িয়ে।"—বলিয়াই সে আর-এক চুমুক ঢুক্ করিয়া গিলিয়া বলিল, "হুঁ, ঠিক—"

কপিল চক্কোত্তি লোকটা একটুখানি ক্ষ্যাপাটে-গোছের বয়স কম নয়—পঞ্চাশের কাছাকাছি, সজনী কেনারামের চেয়ে কিছু বড়ই হইবে। কিন্তু দেখিতে অত্যন্ত বেঁটে, মুখে একরাশ দাড়ি-গোঁফ, চেহারাটা নিতান্ত খারাপ।

ঘরে বৌ আছে। বৌ ভারি দজ্জাল।

ছেলে পুলে হয় নাই। হইবার আশাও নাই।

বৌ বলে, "বসে' বসে' ভাত খাবি ত' দু'কলসি জল নিয়ে আয় পুকুর থেকে।"

পিতলের বড় বড় দুইটা কলসি লইয়া কপিল স্নান করিতে যায়।

চা খাইতে চাহিলে বলে, "লাট-সায়েবের মুরোদ কত? কারও ঘরে খেগে যা।"

দুধ-চিনি না পাইলে অন্তত নূন দিয়াও গরম চায়ের জল একটুখানি গ্রামের প্রায় সকলেই খায়। কপিলেরও বাদ পড়ে না। যেখানে যায় অন্তত জোর-জবরদস্তি করিয়াও একটুখানি খাইয়া আসে।

অনেক চেষ্টা করিয়াও গরম চা-টুকু কপিল তখনও পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারে নাই।

কেনারাম বলিল, "হারামজাদা এ-পাড়ায় মর্‌তে কেন তুই,—এ-পাড়ায় কেন?"

কপিল এতক্ষণ কথা কহে নাই, একমনে চা খাইতেছিল। এইবার ফিক্ করিয়া একবার হাসিয়া ফেলিল।

কেনারামের তখন আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে আর রাগ সাম্‌লাইতে পারিল না; চায়ের বাটিটা কপিলের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "নে শালা নে, তবে তুই-ই খা।"

বাটিটা ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল, কপিলের কাপড়টাও ভিজিয়া গেল। তা যাক্। ইহার জন্য গরম চা ছাড়িয়া ওঠা যায় না। কপিল উঠিল না। বাটির অবশিষ্ট চা-টুকু নিঃশব্দে শেষ করিয়া বাটিটি সেইখানে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "নে কেনারাম, ধুয়ে রাখ্।"

একে সে রাগিয়াই ছিল তাহার উপর কপিলের এই কথাটা শুনিবামাত্র সে তাহাকে মারিতে গেল।

কপিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাস্তায় গিয়া নামিল, বলিল, "গাড়ুর জলটা ত' খেলি।"

রাগে কেনারামের চোখের পাতা দুইটা ঘন ঘন নড়িতেছিল। বলিল, "বামুন-ঘরের গরু—।" রাগে তাহার আর কথা বাহির হইল না, চোখের পাতার সঙ্গে ঠোঁট-দুইটাও নড়িতে লাগিল।

ব্যাপারটা দেখিবার জন্য দোকানের ভিতর হইতে

সজনী ও তাহার কয়েকজন খরিদ্দার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভুবন স্যাকরা কয়েক্-পয়সার সুপারী খরিদ করিয়া সেগুলি তখনও বাঁধিবার অবসর পায় নাই, তাহাই সে তাহার কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "কপিলের বাপ একজন পণ্ডিত ছিল গো—সংস্কিতো জান্‌তো।"

আর একজন কে বলিল, "আর ওই তার ছেলে।"

কথাটা শুনিয়া রাস্তার উপর হইতে কেনারামকে উদ্দেশ করিয়া কপিল বলিতে আরম্ভ করিল, "কেনা, কেনৌ, কেনাঃ—কেনাম্, কেনৌ, কেনাঃ—কেনেন, কেনাভ্যাম্, কেনেভ্যঃ।"

এবং ইহাই বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল।

কেনারাম ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল; সজনী দত্ত তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কর কি মুখুজ্যে, ও কি মানুষ?" একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিল, "বৌকে লুকিয়ে ভাতের চা'ল চুরি করে' আনে,—এনে' ছোলাভাজা কিনে' খায়।—ওরে

ও জগন্নাথ! তোর মাকে বল্ ত' বাবা, মুখুজ্যের জন্যে আর একবার চায়ের জল চড়িয়ে দিক্।"

কথাটা শুনিয়া এতক্ষণে মুখুজ্যে-মহাশয়ের যেন ধাত আসিল; পুনরায় যথাস্থানে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিল, "শালা ক্ষ্যাপা, শালা ক্ষ্যাপা, ক্ষ্যাপা রয়েছে শালা আসল বদমায়েস্।"

সুমুখের রাস্তা দিয়া ঝুড়ি মাথায় করিয়া একটা লোক পার হইয়া যাইতেছিল। কেনারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি তরকারি হে, কি তরকারি? নামাও না বাবা!"

লোকটা চলিতে চলিতে জবাব দিল, "এ তরকারি খেতে পারবেন না বাবু—"

"কি এমন তোমার কফি-মুলো আছে হে, যে খেতে পারব না? নামাও, নামাও—কেউ মার্-ধোর করবে না—নামাও।"—বলিতে বলিতে কেনারাম মুখুজ্যে উঠিয়া গিয়া তাহার ঝুড়ির পিছনের দিকটা ডান হাত দিয়া টানিয়া ধরিল।—"শালা গণেশ পাঁড়ের দায়ে হাটটি উঠে গিয়ে আমাদের এই জ্বালা!"

"মুরগীর ডিম আছে বাবু, এই দেখুন না!"—বলিয়া লোকটা তাহার মাথা হইতে ঝুড়িটি নামাইল।

কেনারাম মুখুজ্যে লাফাইয়া উঠিল:

"মুরগীর ডিম!"

"হাঁ বাবু, ইষ্টিশনে সায়েবদের জন্যে।"

[illegible]গীর ডিম ত' এ রাস্তায় কেন? এই বামুনের [illegible]-মাঝে, এই ঠাকুরস্থাবতার থানের উপর [illegible]

[illegible]খুজ্যের চোখের পাতাদুইটা যেন সেকেণ্ডে [illegible]করিয়া উঠা-নামা করিতে লাগিল।

লোকটি পুনরায় ঝুড়িটি মাথায় তুলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, কেনারাম মুখুজ্যে বাধা দিয়া বলিল, "না, না, সেটি হচ্ছে না বাপ্‌ধন, দাঁড়াও। সকাল বেলায় মুরগীর ডিম ছুঁইয়ে ত' আমার চান্ ঘটালে, তার উপর আস্পর্দ্ধাও ত' তোমার কম নয় বাবা! দাঁড়াও—ওরে কে আছিস্ এখানে, ডাক্ ত' গণেশ পাঁড়েকে!"

"গণেশ পাঁড়েকে কেন? এই যে আমরা রয়েছি।" —বলিয়া হরেকৃষ্ণ তাঁতি তাহার মাথা হইতে যাত্রার দলের

দরুণ আদায়ী-চাউলের ডালাটি নামাইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিয়াছিল, লোকটা বুঝি তরকারি বিক্রি করিতে আসিয়া দাঁও বুঝিয়া চড়া দাম হাঁকিয়াছে। বলিল, "ও-সব চল্‌বে না কত্তা, এ-গাঁয়ে একদর।"

এ-পাড়ার ও-পাড়ার আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণের ছোক্‌রা, যাত্রার দলের চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইতেছিল। হরেকৃষ্ণর পশ্চাতে তাহারাও আসিয়া পৌঁছিল।

রাখহরি পাঠক পশ্চিম-পাড়ার লোক। বলিল, "চল হে চল, আমাদের পছি-পাড়ায় চল।"

পানু গাঙ্গুলি বলিল, মাইরি আর-কি! না হে না, তার-চেয়ে চল আমাদের মনসা-ঘরে,—সাধারণী-জায়গা বাবা, কেউ টুঁ শব্দটি কর্‌বে না।"

কেনারাম মুখুজ্যে বেগতিক দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আ—মলো যা! আচ্ছা বেকুব ত' তোরা! এঁড়ে না বক্‌না আগে ভাল করে' দেখ্ নারে বাবা, তারপর কথা কইবি।—মুরগীর ডিম এনেছে বেচ্‌তে, তা জানিস্?"

"মুরগীর ডিম!"

একসঙ্গে প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল।

কেনারাম মুখুজ্যে বলিল, "তবে আর বলছি কি শালাকে। এই বামুনের গাঁ, তার উপরে আবার এই ধরম্‌তলা......"

"ওই! তবে মারো হে শালাকে।" বলিয়া—রাখহরি পাঠক দূরে দাঁড়াইয়া নাক ঝাড়িতে লাগিল।

পানু গাঙ্গুলি সায় দিয়া বলিল, "হাঁ ঠিক্। দাও সেই চাষার মতন করে।"

হরেকৃষ্ণ তাঁতি বলিল, "তার চেয়ে কিছু অর্থদণ্ড হোক্।"

"তবে তাই কর যা-খুশী, কিন্তু ষোল-আনার কম ছেড়ো না তা বল্‌ছি।"—কেনারাম মুখুজ্যে একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল।

সজনী ময়রা পুনরায় দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, বলিল, "গরীব লোক,—যা বেটা তবে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে ওই বাবা-ধম্মরাজকে পেনাম করে' যা, বল্, আর কখনও এ কাজ করব না।"

এতগুলা লোকের ব্যাপার দেখিয়া ডিমওয়ালা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাখহরি পাঠক আগাইয়া আসিয়া বলিল, "শুধু জরিমানা নয়, নাক্‌খৎ দাও আড়াই-হাত।"

"তবে এই চার গণ্ডা পয়সা লেন বাবু।"—বলিয়া অতি কষ্টে লোকটি তাহার কোঁচড় হইতে দুইটি দু-আনি বাহির করিয়া সজনী ময়রার হাতে দিয়া তাহাকেই একটি প্রণাম করিল।

"আমাকে পেনাম করে না, যাও, আর রামপাখীর ডিম-ফিম্ নিয়ে এসো না এ-গাঁয়ে।"—বলিয়া সজনী দত্ত দুয়ানী দুইটি কেনারাম মুখুজ্যের হাতে দিয়া পুনরায় দোকানে গিয়া ঢুকিতেছিল, জগন্নাথকে চা আনিতে দেখিয়া বলিল, "দাও মুখুজ্যেকে দাও।"

রাখহরি পাঠক হাত পাতিয়া বলিল, পয়সাগুলি ট্যাঁকে গুঁজো না মুখুজ্যে—দাও গাঁজা আনি।"

চোখ মিট্‌মিট্ করিতে-করিতে বিরক্ত হইয়া কেনারাম বলিল, "না রে না, গাঁজা আনে না, সাধারণীর পয়সায় গাঁজা আনে না।"

পান্নু গাঙ্গুলি বলিল, "বেচু ময়রা বেগুনি ভাজছে গরম গরম—"

"সেই ভাল।"

কেনারাম এক হাতে চায়ের গ্লাসটি ধরিয়া অন্যহাতে দু-আনি দুইটি রাখহরির পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল।

রাখহরি সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া অত্যন্ত অনুনয়ের স্বরে বলিল, "না মুখুজ্যে, দুই-ই আসুক্,—দু-আনার তেলে-ভাজা, আর দু-আনার—"

চায়ের গ্লাসে বারকতক ফুঁ দিয়া কেনারাম একবার রাখহরির দিকে সহাস্যে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তবে তু-ই যা, কিন্তু ভাল দেখে বেশ সোঁটা সোঁটা বেছে বেছে এক দু-আনি ওজন করে' আনিস বাপু,—আর ওই "বরি-বাম্‌নীর কাছে আনিস্‌নি যেন—বেটি ভারি চোর।"

চুরি করিয়া গোপনে গাঁজা-আফিং বেচার ব্যবসাটা তখন এ গ্রামে খুব জোর চলিতেছে।

চাউলের ডালাটি সজনী ময়রার দোকানের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া হরেকৃষ্ণ কেনারামের কাছ হইতে হাত

খানেক্ দূরে গিয়া উবু হইয়া বসিল। বলিল, "আজ আচ্ছা করেছেন মুখুজ্যে, এমনি না করিলে কি আর গাঁ জব্দ হয়,—আচ্ছা করেছেন ডিমওয়ালাকে।" —বলিয়া সে ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসিতে লাগিল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার সে হাসি থামিলে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আপনার ওই গেলাসের পেসাদ একটুখানি···মানে, রোজ সকালে আমার এক গেলাস করে' চাই'ই, তবে কিনা বাসি দুধে চা তেমন সুবিধে হয় না। বুঝেছ গাঙ্গুলি—"

পান্নু গাঙ্গুলিকে উদ্দেশ করিয়া আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তেলে ভাজার ঠোঙ্গা হাতে লইয়া রাখহরিকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে সব বন্ধ হইয়া গেল।

রাখহরি বলিল, "দোকানে বসে' ছিল শালা কপালে, —নিলে দুটো ঝাঁ ক'রে তুলে।"

"তুই দিলি কেন ওকে?"—বলিয়া গেলাসের অবশিষ্ট প্রসাদটুকু হরেকৃষ্ণর হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া, চোখের পাতা দুইটা মিট্ মিট্ করিতে করিতে কেনারাম একবার রাখহরির মুখের পানে তাকাইল।

"কি করব, এক হাতে এই—আর এক-হাতে এই—"

—বলিয়া রাখহরি তাহার ডানহাতের ঠোঙ্গা ও বাঁ-হাতের চোরাই-পুঁট্‌লি দেখাইয়া দিল।

তেলে-ভাজার ভাগ-বণ্টন পানু গাঙ্গুলি-ই করিয়া দিল। পোঁট্‌লা খুলিয়া রাখহরি গাঁজা টিপিতে বসিল।

প্রসাদ পাইয়া হরেকৃষ্ণ তাঁতি তাহার আনন্দের উচ্ছ্বাস আর দমন করিতে পারিল না। সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "সে দিন হন্নেফুলি গেলাম একটা কাজে। শুনুন মুখুজ্যে, শুনুন! সন্ধ্যেবেলা। রেবতী পোদ্দারের সেই যে দোকানটা আছে, তারই সামনে গাঁয়ের সেই রাস্তাটার একপাশে ক'জন বাম্ভূণদের ছোক্‌রা বসেছিলেন। রাশ গোসাঁইকে চেনেন ত'? আমি গিয়েছিলাম পাঁটা আন্‌তে তারই ঘরে। আমিও সেইখানে বসে। এমন সময় হলো কি,—কোথাকার কে একটা লোক জুতো পায়ে দিয়ে মচ্‌ মচ্‌ করে' তাদের সাম্‌নে দিয়েই পেরিয়ে গেল। একজন জিজ্ঞেস্‌ করলে, কোথা বাড়ী?"

'আজ্ঞে পড়াশ্‌ কোল্‌।'

'তোমরা?'

'আমরা শৌ—মণ্ডল।'

"শুঁড়ি, বেটাচ্ছেলে শুঁড়ি—বুঝেছেন কিনা! আর যায় কোথা! তড়াক্ একজন উঠে গিয়ে ধর্‌বি ত' ধর্ বেটার একেবারে টুঁটিতেই। তা—পরে বাবু, মার্ ত' মার্ একেবারে বেদম্ মার্—জুতো খুলে দুমা-দুম্ দুমা-দুম্… বেটা শুঁড়ি! বেটার জল ছুঁলে পাচ্চিত্তি করতে হয়,—আর বেটা কিনা অতগুলি বাম্ভূণের মাঝ দিয়ে, জুতো পরে পেরিয়ে গেল!"

"নোয়া শালা, মাথা নোয়া"—বলে' ত' দিলে একজন ছোক্‌রা দুম্ করে' তার ঘাড়ে এক কিল মেরে মাথাটা নুইয়ে। বাস্! বেটা সাত হাত নাকখৎ দিয়ে সটান লম্বা হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে সেদিন উঠে গেল। সেই থেকে সব জব্দ,—বুঝেছেন মুখুজ্যে, হন্নেফুলির বামুণদের নাম শুনলে দশখানা গাঁ একেবারে টঁটরস্থ হয়ে ওঠে। বুঝেছেন?"—বলিয়া সে হাতের গ্লাসটি নামাইয়া দিয়া গাঁজার প্রসাদ পাইল।

যাত্রার দলের জন্য আদায়ী-চালগুলি তাহারা সজনী ময়রার দোকানে বিক্রি করিতে আসিয়াছিল। প্রসাদ

পাইয়া ডালার চালগুলি মাপিবার জন্য দোকানের ভিতর হইতে হরেকৃষ্ণর ডাক পড়িল।

গণেশ পাঁড়ের ছোট ছেলেটা তেলের একটি ছোট ভাঁড় লইয়া সজনীর দোকানে তেল কিনিতে আসিয়াছে।

বাহিরে বসিয়া রাখহরির বেগুনি-সেবা চলিতেছিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সে এই ছেলেটাকে হাতের ইসারা করিয়া বলিল, "এই ভ্যাঁটরা! শোন্!"

ছেলেটা সেইদিক পানে ফিরিয়া তাকাইল।

রাখহরি তাহার বাঁহাতের ঠোঙ্গা হইতে একটি বেগুনি তুলিয়া হাত বাড়াইয়া ছেলেটাকে দেখাইল, বলিল, "খাবি? গরম বটে।"

ছেলেটা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া হাত বাড়াইল।

"ছাই খা, পিণ্ডি খা, গরু খা।"—বলিয়া রাখহরি তাহার হাতের বেগুনিটি টুপ্ করিয়া নিজের মুখে পুরিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে—।

মুরগীর ডিম ছুঁইয়া স্নান করিবার জন্য কেনারাম মুখুজ্যে উঠিয়া গেল। অন্যত্রে চাঁদা আদায়ের চেষ্টায় রাখহরি, পান্নু ও হরেকৃষ্ণ তখন চলিয়া গিয়াছে; এমন সময় গণেশ পাঁড়ে তার সেই ভ্যাঁট্‌রা ছেলেটার হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে অত্যন্ত দ্রুতপদে সজনী-ময়রার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা—কোথা সব? কোথায় বেগুনি কর্‌ছে—কার ঘরে?"

দোকানের ভিতর হইতে সজনী বলিয়া দিল, "আমা-দের বেচারামের ঘরে দেখ পাঁড়ে।"

"বেচা! যাই শালা বেচাকে একবার—বেগ্‌নি করা বার করছি, সকাল বেলা ছেলে-কাঁদানো— চল্, চল্ বেটা চল্।"—বলিয়া ভ্যাঁট্‌রাকে আবার টানিতে টানিতে গণেশ বেচারামের দোকানের দিকে চলিতে লাগিল।

বেচু ময়রা তখন তাহার রাস্তার ধারের ছোট চালাটির একপাশে বসিয়া বেগুনি ভাজিতেছিল।

গণেশ পাঁড়ে হাঁকিল, "বেচা!"

উনান হইতে আগুন তুলিয়া, কাশী হাজরা কলিকায় আগুন চড়াইতেছিল, হাত হইতে তাহার কলিকাটা কাঁপিয়া পড়িয়া গেল।

পাঁড়ে বলিল, "দেখ্ বেচা, 'এন্‌চ্যাণ্টমেণ্ট অফ চিল্‌ড্রেন্' বলে' যদি ম্যাজেষ্টরীতে দরখাস্ত করি তোর নামে,—তোর দশাটা একবার কি হয় তা ভেবে দেখেছিস? দিন-দিন বেগুনি ভাজা কি বল্ দেখি,—ছেলে-কাঁদানে দিন-দিন?"

বেচু জাতিতে ময়রা, দোকান করিয়া খায়, মানুষের মন ভুলাইতে জানে। অতি সত্বর হাতের ঝাঁঝরাটি বেগুনির ঝুড়ির উপর রাখিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিল, তাহার পর নিজের বসিবার চট্‌খানা বাঁহাতে সরাইয়া ফেলিয়া বলিল, "বসুন, পাঁড়ে-মহাশয় বসুন।"

"না, আর বসব না। কিন্তু এই বলে' রাখছি বেচা, বেগ্‌নি-টেগ্‌নি আর করিস না। আমরা জাত কন্নুজ্যে,

আমাদের রাগ ভারি খারাপ।”—বলিয়া গণেশ চালার উপর চট্‌খানা টানিয়া লইয়া চাপিয়া বসিল। ভ্যাট্‌রা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বলিল “বস্ বেটা, বোস্ ওই খানে। কাঁদিস্ না—বল্‌ছি, কাঁদিস্ না, কাঁদবি ত’দেব এখুনি টুঁটি টিপে’ মেরে।”—এই বলিয়া সে দন্ত ও হস্তের দ্বারা টুঁটি চাপিবার ইঙ্গিতটা তাহার ক্রন্দনরত পুত্রকে একবার দেখাইয়া দিল।

বেচু তাহার ডালি হইতে দুইটি মোটামোটা বেগুনি তুলিয়া ভ্যাট্‌রার হাতে দিয়া বলিল, “খান্ পাঁড়ে-মহাশয়, ততক্ষণ সেবা দিন্—তারপর এই আর-এক ঝাঁক নামিয়েই—”

পুনরায় সে গরম তেলের উপর বেগুনি ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল, “তবে শুনুন্ পাঁড়ে-ঠাকুর, শুনুন! খড় বলতে ত’ এক আঁটিও নাই আর এ-গাঁয়ে কারও। চড়া দাম পেয়ে ত’ সবাই হুঁ হুঁ। তাই বলি ত’ গরু-বাছুরগুলো তাহ’লে খায় কি? সেইজন্যেই বলি কিনা—দু’চারটে বেগ্‌নি ফুলুরি ভেজে রাখি—বাউরি-বাগদি ছোটলোকগুলো সব দু’চার বোঝা করে’

ঘাস দিয়ে যাবে, আর এই মদের সঙ্গে খাবার জন্যে দু-এক পয়সার তেলে-ভাজা—এই আর কি! বোয়েছেন কিনা পাঁড়ে ঠাকুর, দিন্ আপনার পায়ের ধুলো দিন চারটি।”—বলিয়া হাত বাড়াইয়া পাঁড়েঠাকুরের ধূলিসমাচ্ছন্ন পদতল দুইটি স্পর্শ করিয়া বেচু তাহার মাথায় ঠেকাইল।

কাশী হাজরার কলিকায় আগুন দেওয়া তখন শেষ হইয়াছে, দেওয়ালে-টাঙানো ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট কড়ি-বাঁধা হুঁকাটি পাড়িয়া আনিয়া সে তখন পড়্ পড়্ করিয়া তামাক টানিতে টানিতে একেবারে হায়রাণ হইয়া পড়িয়াছিল; অবশেষে একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, “সেদিনের সেই মোকদ্দমাটার কি হলো পাঁড়ে?”

পাঁড়ে বলিল, “কোন্‌টা? কোন্ মোকদ্দমার কথা বল্‌ছিস? একটি মোকদ্দমা ত' নেই আমার হাতে যে ঝপ্ করে' বলে ফেল্‌ব—কি হলো। সেই কাঙ্গাল সেখের দাঙ্গার মোকদ্দমা?”

“হাঁ হাঁ, সেই কাঙাল সেখ—।”—বলিয়া কাশী হাজরা আবার তাহার হুঁকায় দম দিতে লাগিল।

পাঁড়ে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এই গণেশ পাঁড়ে যে-তরপে দাঁড়ায়, সে তরপের কি আর হার আছে রে কখনও বেকুব? কাঙাল জিতলো। দাঙ্গায় দুটো মাথাও ফাটালে, আবার ডিগ্রিও পেলে। ওরে ওসব অনেক কাণ্ড। মামলা-মোকদ্দমা কি আর সহজ জিনিষ রে বাবা।"

কড়াই হইতে বেগুনি তুলিতে তুলিতে বেচু বলিল "মাথা চাই, বোয়েছেন-কিনা হাজরা-ঠাকুর, ও-সবের এক আলাদা মাথা।"

কাশী হাজরা বলিল, "তা বটে বাপু! মোকদ্দমার নাম শুন্‌লে আমাদের মাথা ঘোরে, আর সেদিন সেই বলরাম মোড়লের জানি-চিনি দিতে গিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম কিনা, পাঁড়ের ভয়ে আদালত-সুদ্যো কাঁপছে-উকিল-মুক্তিয়ার ত' বাপ্‌বাপ্ ডাক ছাড়ে—।"

বেচু বলিল, "ও-ই, সে-কথা কি-আর বল্‌তে! আর—মামলা-মোকদ্দমার কথা আর বলো না হাজ্‌রা, সে-বছর সেই ভাইপো করলে মাম্‌লা আমার নামে। আমি বলি আদালতে যাব না বরং সেই ভাল—একতরপা ডিগ্রিই হোক্। গেল্লাম না। তা বাপু তুমি যাই বল,

এই আদালত-ফাদালত করে' কোন রকমে শাশিত্ করে' রেখেছে এই দেশটাকে—না কি বল পাঁড়ে ?"

পাঁড়ে খিঁক্ খিঁক্ করিয়া খানিক্‌টা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "শাশিত্ না আমার ইয়ে করেছে বেচু। আইনের ফাঁকি বাবা সব—আইনের ফাঁকি, আর মার্-প্যাঁচ্। বল্—কোন্ শালার মাথা ফাটাতে হবে এ-গাঁয়ে বল্—আমি দিচ্ছি চ্যালা কাঠ্ দিয়ে দুফাঁক্ করে' তোর সাক্ষাতেই। দেখি তাপরে কি হয়,—ফুস্ আর ফাস্! এই গোঁফ জোড়া—দেখেছিস্ কিনা—" —বলিয়া পাঁড়ে তাহার গোঁফে হাত দিয়া আবার বলিল, "এই গোঁফ্—মা-বাপের ছাদ্ধের সময় ফেলিনি এই গোঁফ্—মাথা কামিয়েছিলাম, দাড়ি কামিয়েছিলাম, কিন্তু এই গোঁফ্ কামাইনি বাবা! মরদ্—মরদ্ চাইরে বেচু, মরদ্ চাই! মরদ্ কোন্ শালা আছে এই গাঁয়ে—মরদ্? একথা ত' হাঁক্ মেরে বলছি আমি,—কই, কোন্ শালা আস্‌ছে—আস্থক্।"

"এই যে পাঁড়ে!"

বলরাম মিস্ত্রি সেই পথ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল,

পাঁড়েকে দেখিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর ?"

মিস্ত্রি বলিল, "গাঁয়ে এক ভারি মজার ব্যাপার ঘটে গেছে।"

উপস্থিত সকলেই তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

"কি ব্যাপার—?"

মিস্ত্রি বলিল, "একজন ডিমওয়ালা পেরিয়ে যাচ্ছিল সজনী দত্তর দরজা দিয়ে—"

"তারপর ?"

"এক ঝুড়ি মুরগীর ডিম নিয়ে যাচ্ছিল ইষ্টিশানে।"

কাশী হাজরা বলিল, "হুঁ। যায় বটে; দেখেছি। তারপর ?"

মিস্ত্রি বলিল, "তারপর আর-কি, নিয়েছে ক'জন ছোকরা মিলে' কিছু আদায় করে'। আমাদের বেনোয়ারী ওস্তাদের দলটি ছিল, আর ছিলেন আমাদের কেনারাম মুখুজ্যে—"

বেচু ময়রা, মিস্ত্রিকে কি-যেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, গণেশ পাঁড়ে তাহাকে চুপ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কত আন্দাজ হবে?"

"তা—লোকটা ত ভয়ে-ভয়ে বল্‌ছে এখন পাঁচসিকে, কিন্তু পাঁচসিকে ত' আমার বিশ্বেস হয় না—আরও কিছু বেশিই হবে।"

গণেশ পাঁড়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মার্‌-ধোর্‌?"

"তা কিছু হয়েছে বই-কি! আপনি নিজেই জিজ্ঞেস্‌ করুন্‌-গে না একটু উঠে' গিয়ে। হাল্‌-হবিগৎ সবই টের পাবেন।"

পাঁড়ে বলিল, "কোথায়—কোথা গেল সে লোকটা?"

মিস্ত্রি বলিল, "আপনার ঘরেই ত' দিলাম পাঠিয়ে, তবে আর বলছি কেন ঠাকুর। রাস্তায় কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল, আমি বলি ত' আপনি হয়ত ঘরেই আছেন, তাই বল্‌লাম বলি, যা তরে, এর পিতিবিধেন্‌ যদি-কিছু হয়, তো ওই পভূর কাছেই হবে।"

"তাই নাকি? তবে ত' উঠ্‌তে হয়!"

গণেশ পাঁড়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাড়াতাড়ি শালপাতার একটা ঠোঙ্গা তৈরী করিয়া কয়েকটি বেগুনি-সমেত ঠোঙ্গাটি ভ্যাট্‌রার হাতে দিয়া বেচু বলিল, "যাও, সেবা দাওগে। পেনাম্। কিন্তু বোয়েছেন কিনা পাঁড়ে-ঠাকুর, বেগুন আনলাম ইষ্টিশানের হাট থেকে। চার-আনা সের। বলি, আচ্ছা তাই তা-ই! আমাদের এই ধরম্-তলার হাটে ত' আর উ-কম্ম নাস্তি। আচ্ছা করেছেন আপনি সেদিন সেই চাষাকে ঠেঙ্গিয়ে। বেটারা ভারি বজ্জাত।"

কাশী হাজরা বলিল, "আচ্ছা বেগুন বাবু সেদিনের। কিন্তু গোলমালে তিনটির বেশি আর পাওয়া গেল না।"

বলরাম মিস্ত্রি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু আঁচল-ভর্ত্তি নিয়ে 'গেছলাম দাদা, তা তোমরা যা-ই বল আর তাই বল। পাঁড়ের দৌলতে চারটি দিন পুরো দু'বেলা,—বেগুন পোড়া, বেগুন ভাজা, বেগুনের তরকারি, বেগুনের চড়্‌চড়ি, মায় বেগুনের অম্বল।"

গণেশ পাঁড়ে থামিল। বলিল, "দেখ্‌লে ত' সেদিন বেচু, বেটা আমার কী উল্টিয়ে নিলে? বলে-কিনা যুদ্ধুর

বাজার। যুদ্ধুর বাজার ত' তোর বেগুনে যুদ্ধ কিসের রে হারামজাদা! দিলাম ঘা-কতক বসিয়ে। অন্যায় সহ্য হবে কেন? আমরা জাত-কনুজ্যে। আমাদের রাগ ভারী খারাপ।—ওরে ও ভ্যাঁটরা, নিজেই যে সব মেরে দিলিরে হারামজাদা,—রাখ্ তোর মায়ের জন্যে রাখ্ দুটো,—কই দেখি।”—বলিয়া ঠোঙ্গা হইতে একটি বেগুনি তুলিয়া মুখে পুরিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে গণেশ পাঁড়ে বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

বলরাম মিস্ত্রি এইবার ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। কাশী হাজরার তামাক খাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। কলিকাটির জন্য হাত বাড়াইয়া মিস্ত্রি জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা হাজরা-ঠাকুর, যুদ্ধু-যুদ্ধু ত' খুব শুন্‌ছি আজকাল, কিন্তু যুদ্ধুটা ঠিক কোন্‌খানে হচ্ছে?”

ইউরোপে তখন যুদ্ধ বাধিয়াছে। বিংশ-শতাব্দীর মহাযুদ্ধ।

হাজরা-ঠাকুর হুঁকায় শেষ-টান টানিতে টানিতে গম্ভীরভাবে কহিল, “বিলেত,—বিলেত।”

বেচু আবার তাহার বেগুনি ভাজার কাজে মনো-

নিবেশ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা হাজরা-মশায়, বোয়েছেন কিনা, বিলেতটা আমাদের এই দেশের কোন্‌বাগে ?"

কাশী হাজরা হুঁকা হইতে গরম কলিকাটা ধীরে-ধীরে বলরাম মিস্ত্রির হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল,—"পূব—ঠিক একেবারে খারা পূব্।"—তারপর একটুখানি থামিয়া বলিল, "সেদিন সেই আদালতে গেছলাম। ফিরতে রাত হলো। উড়ো-জাহাদ্ দেখে এলাম সেদিন।"

মিস্ত্রি কলিকা টানিতে টানিতে বলিয়া উঠিল, "সে আবার কি-রকম আজ্ঞে ?"

সুমুখের মাঠে বেচুর গরুর গাড়ীটা পড়িয়া ছিল, হাজরা বলিল, "ওই গাড়ীটার তে-ডবল হবে, জন পঁচিশ-ত্রিশেক লোক অনায়াসে চড়তে পারে। তারপর পাঁ—ই করে' আকাশে উড়ে চলে' যায়।—ডাঙ্গায় পড়লেই গাওয়া-গাড়ী, আবার জলে পড়লেই জাহাদ্।"

"তাহ'লে ত' সে এক তাজ্জব ব্যাপার বোয়েছ কি-না!"

কড়াই-এর বেগুনিগুলা পুড়িয়া যাইতেছিল, বেচু

তাড়াতাড়ি সেগুলিকে কড়াই হইতে নামাইয়া বলরাম মিস্ত্রির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "ঠুক্-ঠাক্ করে' শুধু কাঠের গাড়ী তৈরী করা নয় মিস্ত্রি, বোয়েছ কিনা, এমনি এক-আধটা—"

কাশী হাজরা গম্ভীরভাবে কহিল, "আজ তোমাদের দেখাব। রোজ ওঠে।"

সেদিন রাত্রে আকাশের সন্ধ্যা-তারাটিকে কেহ আর তারাই বলিল না……

কাশী হাজরা বুঝাইয়া দিল, "অনেক দূরে রয়েছে বলে' আমরা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না, কিন্তু ওটা চল্‌ছে,—ঘণ্টায় তিন-চার কোশ ত' খুব।"

বলরাম মিস্ত্রি তাহার কপালে হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উর্দ্ধে আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "হুঁ, নড়্‌ছে। দেখ তোমরা বাঁ-চোখটা বুজে,—এইদিকে একটুখানি কাৎ হয়ে—।"

অনেকেই দেখিল।

সেইদিন হইতে বেচারাম ময়রা কিছু কিছু বুঝিতেছিল —মনে হইতেছিল যেন তাহার চোখ ফুটিয়াছে।

মাঝে মাঝে সে তাহার স্ত্রীকে উঠানের উপর টানিয়া আনে। মাথাটা উপরের দিকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলে,—"উ—ই দেখ্—"

স্ত্রী বলে, "দেখলাম।"

বেচারাম বলে, "আর এই দেখ্, বোয়েচিস্-কিনা, এই কদম-গাছটার দিকে তাকা, এই দিকটা পূব-দিক, এই দিকে সূয্যি ওঠে ;—আর ও-ই যে দেখচিস্ অনেক-গুলো গাছ, ওর ও-পারেই তোর ডাবির শ্বশুরঘর,—তার ওপারে, তার ও-পারে, অনে—ক দূর—সেইখানে বিলেত—।"

আরও বুঝাইবার চেষ্টা করে।—পৃথিবীটা অনেক বড়। ……এবং সেখানে বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহও হয়।





ডিমওয়ালা তাহার মাথার ঝুড়িটি নামাইয়া গণেশ পাঁড়ের দরজায় বসিয়া ছিল।

এবং সেই দরজা হইতে একটুখানি দূরে প্রকাণ্ড একটা ফণী-মনসার ঝোপের পাশে গণেশ পাঁড়ের বড় ছেলে চৈতন পাঁড়ে দাঁড়াইয়া আছে। যমের অরুচি চেহারা, অত্যন্ত কালো—কদাকার। কাহার মাঠ হইতে চুরি করিয়া এক বোঝা আধ-পাকা ধান কাটিয়া আনিয়া দরজার উপর অপরিচিত ওই লোকটার ভয়ে বোঝাটা লইয়া সে পার হইতে পারিতেছিল না।

গণেশ পাঁড়ের নজর সর্ব্বপ্রথমে সেইদিকেই পড়িল।

"পেরিয়ে আয় বেটা, পেরিয়ে আয়। আমার ছেলেরে তুই—আমার বেটা।"

সাহস পাইয়া বোঝাটা মাথায় তুলিয়া চৈতন ঘরে ঢুকিল।

"বাহা রে বাহা রে বেটা জোয়ান!—কার মাঠে?"

ঘরের উঠান হইতে চৈতন বলিল, "বাবুদের।"

গণেশ তাহার বাঁ-পাশের গোঁপের ডগাটা পাকাইতে

পাকাইতে বলিল, "হুঁ। প্রথমে জমিদার। রুই-কাৎলা আগে,—তারপর চুনোপুঁটি।"

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া সে ডিমওয়ালার দিকে ফিরিয়া কহিল, কি রে—কি বটেরে তোর?"

ডিমওয়ালা অনেক কষ্টে কাঁদিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হুজুর—"

"বুঝেছি, বুঝেছি.—কত নিয়েছে বল্?"

"আজ্ঞে আনা-চারেক্।"

"ধেৎ বেটা পাজি!"

ডিমওয়ালা চমকিয়া উঠিল।

"আনা-চারেক্ কিরে বেটা,—আনা-চারেক্ কি? টাকা-চারেক্ বল্। তার কম মাম্‌লা চলে না।—দাগ-রাজি? গায়ে দাগ হয়েছে ত?—মারের দাগ?"

"আজ্ঞে না। মিছা কথা বল্‌ব কেন, সে সব কিছু—"

ঘরের উঠানে খেজুরের একটা ছড়ি পড়িয়া ছিল, গণেশ পাঁড়ে তাড়াতাড়ি সেইটা কুড়াইয়া আনিয়া সপ্ সপ্ করিয়া

উপরি-উপরি দু'তিন ছড়ি লোকটার পিঠের উপর বসাইয়া দিল।

যন্ত্রণায় লোকটা চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। "আর এ-গাঁয়ে আসব না বাবু—"

"চোপ্ চোপ্, শালা চোপ্! আস্‌বি না কি,—আস্‌বি না কি? খুব আস্‌বি।"—বলিয়া পাঁড়ে তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "ঠিক, এই ঠিক দাগ হয়েছে—রক্তমুখী দাগ। বলবি, মেরেছে, উল্টে চারটি টাকাও কেড়ে নিয়েছে।—আচ্ছা, এইবার খরচ কত করতে পারবি বল্?"

লোকটা একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "খরচ আজ্ঞে ক্যাম্‌নে করি—গরীব লোক, ডিম বেচে খাই।"

ঘাড় নাড়িয়া পাঁড়ে বলিল, "উঁহুঁ। দশ টাকা আমার, যাতায়াত খরচা বাদে।—আর সাক্ষীর জন্য,—আচ্ছা ওই দশ টাকা।"

ডিমওয়ালা পাঁড়ের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"আজ্ঞে হুজুর! খরচ আমি কিছুই করতে পারব না।"

পা দুইটা ছাড়াইয়া লইয়া পাঁড়ে বলিল, "তবে দূর্ হ, দূর্ হ! যাঃ! কপালে তোর মার ছিল—খেয়ে গেলি, বাস্। টাকা না হলে মামলা হয় না।—আচ্ছা, কষ্ট করে' যখন এসেছিস,—ওরে ও চৎনা, ও চৈতন! কাগজ-পেন্সিল আন্ দেখি, একটা কাগজ-পেন্সিল।"

চৈতন কাগজ-পেন্সিল আনিয়া দিল। কাগজটা দরজার কপাটের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার উপর ভোঁতা একটা পেন্সিল দিয়া চর্ চর্ করিয়া মিনিট্-কয়েকের মধ্যেই গণেশ ইংরাজিতে কয়েকটা নাম লিখিয়া ফেলিল।

তাহার পর কাগজটা সুমুখে ধরিয়া বলিল, "এই সব নাম লিখে দিলাম। ইংরাজিতেই লিখলাম।

কেনারাম মুকুর্জ্জি—
রাখহরি পাটেক্—
পানকিষ্ট গ্যাঙ্গুলি—
গডাঢর চাটুর্জ্জি—
হরেকিষ্টো টাঁটি—

আর ঘটনাস্থল—পেলেস অভ্ অকুরেন্স হচ্ছে,—সজনী

ময়রার দোকান। ধর্—হাত পাত্—এই চির্কুট্ ধর্।”

কাগজের টুক্রাটি ডিমওয়ালা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

“বাস্! সোজা চলে যা ইষ্টিশান। সাম্নেই থানা। ইন্‌স্পেক্টরবাবুর কাছে দে ঠুকে—এক নম্বর ডাইরি। এই এই লোকের নাম। বল্‌বি, হুজুর, মেরে’-ধরে’ চারটি টাকা কেড়ে’ নিলে। মারের দাগ দেখাবি। রক্তমুখী দাগ।”

গণেশ পাঁড়ের দাঁতগুলা হঠাৎ এতজোরে কড়্‌মড়্ করিয়া উঠিল যে ঠিক মনে হইল যেন সে ছোলাভাজা চিবাইতেছে। বলিল ঃ

“হায় রে টাকা! টাকা যদি খরচ করতে পারতিস্ হতভাগা, ত’ দেখিয়ে দিতাম ওই শালা কেনা, আর ওই শালা—। বল্‌বি, সাক্ষী অনেক আছে হুজুর, সবাইকে চিনি না।—আমারও নাম করতে পারিস্— গানেশিলাল পাণ্ডে। জি, এল, পাণ্ডে বললেও হয়— জি-এল্ পাণ্ডে!”

ডিমওয়ালা বিদেশী মানুষ। তাই তাহার ষ্টেসনের এক গার্ড-সাহেবের বাবুর্চ্চি এবং খান্‌শামা দুই-ই। ষ্টেসনটি জংসন হইয়াছে। অনেকগুলি সাহেব-সুবার বাস। মুরগীর ডিমের ব্যবসাটা এখানে ভাল চলিবে ভাবিয়া জসিডির 'সিগ্‌ন্যাল্-ম্যানের' কাজে জবাব দিয়া সে এখানে আসিয়াছে। কিন্তু যাহার খাতিরে সে তাহার অমন সাধের 'নোক্‌রি' ছাড়িয়া দিল, এখানে বুঝি সে খাতির আর টেঁকে না। এই ভাবিয়া সে তাহার ডিমের ঝুড়িটি পুনরায় মাথায় লইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে ষ্টেসনের দিকেই চলিয়া যাইতেছিল।

পশ্চাৎ হইতে গণেশ পাঁড়ে আবার হাঁকিল—

"শোন্!"

ডিমওয়ালা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই পাঁড়ে-ঠাকুর নিজেই একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিল। বলিল, "থানা চিনিস্? থানা? না চিনিস যদি ত' এক কাজ কর্। বরাবর সটান্ চলে যা লাইনের ধারে। বাঁ-দিকে বড় ফটক্। সেইখানে যাকে শুধোবি, সেই-ই বলে দেবে—কিশোরী পাঁড়েকে সবাই চেনে।—হেড্ চাপ্‌রাশী,—

আমারই ছোট ভাই; কটকে কাজ করে। ইয়া লম্বা-চওড়া জোয়ান্—ভুঁটিয়াল চেহারা; কাঁধে দেখবি মস্ত একটা চোটের দাগ। তাকে আমার ওই কাগজ দেখাবি, বল্‌বি,—থানার কাজ, আপনার দাদা পাঠালেন। ইংরেজিতে লেখা,—বল্‌বি, কাউকে দিয়ে যেন পড়িয়ে নেয়। বুঝ্‌লি?"

"যে-আজ্ঞে হুজুর।"—বলিয়া ডিমওয়ালা চলিয়া গেল।

পাশেই কামার-পাড়া। পূর্ব্বে নাকি বস্তিটা মন্দ ছিল না। এখন কতক মরিয়া-ঝরিয়া গেছে, কতক-বা অন্যত্রে বাস করিতেছে। অবশিষ্ট যে-কয়জন আছে তাহারাই কোন রকমে অত্যন্ত হীন অবস্থায় দিন যাপন করে। রাস্তার ধারে একটি ঘরে এখনও কোনরকমে একটি 'হাপর্' মাঝে-মাঝে ফুঁস্-ফাঁস্ করিয়া চলে, লোহা-পিটানোর ঠুং-ঠাং শব্দ হয়,—এবং সেই শাল-ঘরেরই অর্দ্ধেকটায় হরিপদ কামারের গরু বাঁধা থাকে।

ফাল, লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে, কুড়ুল, বঁটি—চাষ-বাসের যাবতীয় লোহার সরঞ্জাম হাতের কাছে সবই বাজারে কিনিতে মিলে, কাজেই হরিপদর কাজ-কর্ম্ম এক প্রকার থাকে না বলিলেই হয়,—তবে এই শীতের প্রথমটায় সব কাজ ফেলিয়া তাহার একবার হাপর্-হাতুড়ি না ধরিলেই চলে না। অগ্রহায়ণে ধান পাকিবে,—পুরানো কাস্তে-গুলা একবার শানানো দরকার।

তাই অনেকেই সেদিন তাহার শালে আসিয়া হাজির হইয়াছিল।

গণেশ পাঁড়ের হাঁক-ডাক শুনিয়া হরিপদর কামার-শালের ভাঙা দরজা হইতে কয়েকজন লোক উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল, বিষণ দে বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে তাহার উপর নজর পড়িতেই পাঁড়ে বলিয়া উঠিল, "ওহে বিষণ, শোন, শোন,—তোমার ছেলেটা সেদিন গাঁজা টানছিল হরেকেষ্টা তাঁতির সঙ্গে, ভাগ্যে আজ সে ছিল না, তা নইলে এইসঙ্গে ওকেও দিতাম গেঁথে'। যাক্, বেটা খুব বেঁচে গেল! তোমার খাতির-টাতির আর থাকবে না বাপু, তাও বলে'

রাখছি। লাট্‌-সায়েবের খাতির নাই আমার কাছে। আমরা জাত কন্নুজ্যে—আমাদের রাগ ভারি খারাপ।” —এই বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বিষণ তাহার পিছন ধরিল। বলিল, “বুঝ্‌তে পারলাম না পাঁড়ে-ঠাকুর, কি বলছ আপনি?”

গণেশ কিন্তু তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল না। আপন-মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, “সব শালাই সমান, হরেকেষ্টা, রেখো, পেনো, আর ওই কেনা-শালা, ওই যে চোখ মিটির্‌-মিটির্‌! শালা ভারি বজ্জাত। সেদিন বলে কিনা, আমার গরুতে ওর ধান খেয়েছে। হাঁ, খেয়েছেই ত! আচ্ছা করেছে। আর মারবি শালা ডিমওয়ালাকে,—মারবি আর কখনও?”—বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিয়া বিষণ দের মুখের উপরেই গণেশ পাঁড়ে সদর দরজাটা হড়াম্‌ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

কিন্তু বিষণ দে ইহার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একেবারে অকুল পাথারে পড়িয়া গেল। ছেলেটা

না হয় গাঁজাই খায়, কিন্তু পাঁড়ে-ঠাকুরের কোপ দৃষ্টিতে পড়িল কেমন করিয়া ?

হাপর্-টানা কাঠের মাথায় লোহার একটা শিকলি ঝুলিত, কিন্তু তাহার অর্দ্ধেকটা হরিপদর বাপের আমলেই ছিঁড়িয়া গেছে। সেই অবধি শিকলির বাকি অর্দ্ধেকটায় কাতার দড়ি দিয়া বাঁধিয়াই কাজ চলিত,—আজ আবার টানিতে টানিতে সেটুকুও ছিঁড়িয়া গেল।

শিকলির ডগায় হরিপদ কাপড়ের একটা ছেঁড়া পাড় দু'-ফেরতা করিয়া বাঁধিতেছিল।

বিষণ দে তাহার কাস্তেটি লইবার জন্য পুনরায় কামার-শালে ফিরিয়া আসিল।

শালের ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া ভূষণ নন্দী তখনও উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। বিষণ ফিরিয়া আসিবামাত্র প্রথমেই সে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কি বলে ? বেটা পাঁড়ে কি বল্‌ছে—কী ?"

পাঁড়ের ওই চৈতন বংশধরটির কৃপায় গত বৎসর পুরা একটি বিঘা জমির পাকা ধান ভূষণ তাহার ঘরে

আনিতে পায় নাই, কাজেই গণেশ পাঁড়ের উপর তাহার আক্রোশ একটুখানি বেশি হইবারই কথা।

বিষণ বলিল, "কি যে বল্‌লে, আর কি যে কইলে, তা ঐ ঠাকুরই জানে রে ভাই—মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।"

হাপরের দড়িটি বাঁধিতে বাঁধিতে হরিপদ কামার তাহাদের বুঝাইয়া দিল;—"পাশাপাশি ঘর বাবা,—কুমিরের সঙ্গে জলে বাস, আমাদের সব দিকেই নজর রাখতে হয়। তোমাদের কাল্‌ও শানাই, আবার ও-বেটার দিকেও—।"

এই বলিয়া ভণিতা করিয়া সে যাহা বলিল তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ও-বেটা প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অম্‌নি ফড়র্‌ ফড়র্‌ করে, উহার কথায় কান দিতে গেলে চলে না। কেনারাম মুখুজ্যে, হরেকিষ্টো, রাখহরি এবং আরও কয়েকজন মিলিয়া আজ সকালে এক ডিমওয়ালাকে মার্‌-ধোর্‌ করিয়া কয়েকটা টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। গণেশ পাঁড়ে সেই ডিমওয়ালাকে উহাদের নামে নালিশ করিতে পাঠাইল। বিষণ দের ছেলে

সেখানে ছিল না, থাকিলে তাহাকেও ঐ সঙ্গে আসামী করিয়া গাঁথিয়া দিত। ইত্যাদি।

একটুখানি থামিয়াই হরিপদ পুনরায় কহিল, "মিছে কথা বলব কেন নন্দী,—চিট্ আমার একটুখানি ছিল ওর সঙ্গে। এক পাড়ায় বাস, গুঁতোর চোটে বাবা বলতে হতো! কি জানি বেটা ঘরে আগুন-টাগুনও ত' ধরিয়ে দিতে পারে!"

ভূষণ নন্দী বলিয়া উঠিল, "খুব পারে—খুব পারে, বেটার অসাধ্যি কম্ম নাই।"

হরিপদ বলিল, "চাষের সময় নাঙ্গলের ফাল্ শানা-নোর জন্যে এক শলি করে' ধান ত' আমরা সব ঘরেই পাই—সে ত' তোমরা সবাই জান। কিন্তু ও আমাকে কোনদিন এক-চোঁচাও ঠেকায় না। সেদিন বললাম ত' বলে কিনা, ঘরের দুয়োরে বাস করে' রয়েছিস্ শালা কামার, ধান কিসের, পায়ের চারটে ধুলো নিয়ে যা।"

বিষণ দে এতক্ষণ ধরিয়া হরিপদ কামারের আগের কথাগুলাই মনে-মনে ইস্তাম্ করিতেছিল। এইবার সে তাহার কাস্তেটি হাতে লইয়া উঠিল।

হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল, "উঠ্‌লে যে?"

বিষণের মুখখানা আগের চেয়ে অত্যন্ত ম্লান দেখাইতেছিল। বুড়ার বয়স হইয়াছে। চোখের উপর ভুরুর চুলগুলা খুব বড় বড়, কতক পাকিয়াছে, কতক্‌-বা কালো। সেই ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া বিষণ বলিল, "উঠ্‌লাম। হুঁ।"

বলিয়াই সে আবার বসিল। এবং এইবার সে হরিপদর খুব কাছে সরিয়া আসিয়া পেশীবহুল তাহার মোটা-মোটা হাড়ের সে বহু পুরাতন হাত-খানি হরিপদর হাঁটুর উপর রাখিয়া ধীরে-ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "তোমার কথাগুলি সব ঠিক্‌, কিন্তু—তুমি জান না হরিপদ, ছেলেটা আমার বুঝলে কিনা—ভারি বদ্‌।"

ভূষণ নন্দী বলিল, "গাঁজাও খায়।"

"আ হা হা হা সে ত—" বলিয়া বিষণ তাহার হাতখানি হরিপদর হাঁটু হইতে তুলিয়া ভূষণের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "সে ত' খায়-ই। সে তুমিও জান—আমিও জানি।"

ঘাড় নাড়িয়া নন্দী কহিল, "হাঁ, আমিও ত' তাই

বল্‌ছি—খায় ত' খায়—আপনার নিজের পয়সাতেই খায়, তা তোর-বাপের কি রে শালা!"—বলিয়া সে তাহার কাস্তে সমেত হাতখানা সেইখান হইতেই গণেশ পাঁড়ের ঘরের দিকে বাড়াইয়া দিল।

বিষণ বলিল, "না না, তা বলো না নন্দী। বাম্ভন,—সে যতই হোক্—দেব্‌তা। তার উপরে বয়সে বড়। তা খাবি ত' খা, পাঁড়ের চোখের সাম্‌নে খাওয়ায় তোর কাজ কি? আপনার ঘরে বসে' খা—লুকিয়ে-চুরিয়ে খা। আর—"—বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আবার আরম্ভ করিল, "তোর ঘর রইল কোথা, আর তুই 'নিশা' করতে গেলি কোথা—হোই পূব্‌-পাড়ায় হরে-কিষ্টো তাঁতির সঙ্গে। আবার শুন্‌ছি, আমার সাত পুরুষে যা কখনও কোথাও নাই—আমার ছেলেটির—" —বলিয়া বিষণ তাহার শূন্য হস্তে একটি গেলাসের কল্পনা করিয়া হাতটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ঢুক্‌-ঢুকুও চল্‌ছে নাকি আজকাল—।"

"যাই, দেখি আবার! হরেকিষ্টোর কাছেই যাই। কাল আসব, বুঝ্‌লে হরিপদ? কাস্তেটা থাক্‌।"

হাতের কাস্তেটি হরিপদর কাছে নামাইয়া দিয়া বিষণ দে উঠিল।

কিন্তু ভাঙা দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় সে ফিরিয়া আসিল। বলিল, "মথন্ বলছে যাত্রার দল কর্‌ব! তা করুক্। নিশা-ভাং খেয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে ভাল। এক-আধ শলি চাল-ধান লাগে, তা আমি বলেছি—লাগুক্, দেব। আর এই গাঁজা, গুলি, আফিং,—এর রেয়াজ্‌টা আজকাল সব-গাঁয়েই। বুঝেছ? কলিকাল আর কাকে বলেছে তবে? সেদিন—অনন্ত নায়েকের সেই গুড্ডিম্ ছেলেটা—দেখি, সেদিন সে-ও ওই একটা কল্‌কে নিয়ে সটান্ টান্‌ছে। উচ্ছন্ন গেল—সব গেল।"

বলিতে বলিতে বিষণ দে এবার সত্য-সত্যই রাস্তায় গিয়া নামিল।

হরেকৃষ্ণর একা ঘর। গাঁয়ে তাঁতি অনেক আছে,

কিন্তু হরেকৃষ্ণর স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন বলিতে কেহ কোথাও নাই। প্রকাণ্ড একটা বস্তির ধ্বংসাবশেষের একটেরে তাহার মাত্র একখানি ঘর কোনরকমে টিঁকিয়া আছে। ঘরখানির মাঝে একটা দেয়াল। এক প্রস্থে নিজে রাঁধে বাড়ে থাকে, আর এক প্রস্থে তাঁত-ঘর। কিন্তু তাঁতটি গত বৎসরের এক দুর্দ্দিনে সে বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে। দিন যে এখন তাহার কেমন করিয়া চলে তাহা সে-ই জানে। তাঁতঘরের গর্ত্তটি এখনও বন্ধ করা হয় নাই। সেই গর্ত্তেরই আশে-পাশে বসিয়া কয়েকজন ছোকরা সকাল-সন্ধ্যা আড্ডা মারে, গল্প করে, তামাক ওড়ায়।

হরেকৃষ্ণ ও রাখহরি দুজনে তখন পাশাপাশি সেইখানে বসিয়া চুপি-চুপি কি যেন পরামর্শ করিতেছিল।

বিষণ দে দরজা হইতে ডাকিল, "হরেকিষ্ট!"

হরেকৃষ্ণ বাহিরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেমন করিয়া কথাটা বলিবে বিষণ দে বুঝিতে পারিতেছিল না, কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "কি রকম যে শুন্‌ছি—"

"কি রকম?"

সে বলিল, "কে নাকি নালিশ কর্‌তে গেল তোমাদের নামে?"

"হুঁ, তাই শুন্‌ছি। ও কিছু না। সেই ডিমওয়ালা ত?"

রাখহরি ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "ডিমওয়ালা আবার কে? ডিম্‌-টিম্‌ জানি না আমরা কিছু, যাও বাপু যাও, তুমি ঘর যাও।" —বলিয়া সে বিষণের হাতে ধরিয়া তাহাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল।

হরেকৃষ্ণও এইবার সেই কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তা বই কি! কে কাকে মেরেছে, কে কার টাকা কেড়ে নিয়েছে, তা আমরা কি জানি? অম্‌নি মিছামিছি যার-তার একটা নাম করে' দিলেই হলো কি না!"

বিষণ ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আমাদের যখন্‌ তখন তোমাদের সঙ্গে—" কথাটা সে শেষ করিতে পাইল না।

রাখহরি বলিল, "তাই বল যে নিজের ছেলেটির

খোঁজ নিতে এয়েছ। না যাও, তোমার মথন্ ছিল না। মথন্ তোমার লক্ষী ছেলে।"

"তাই এসেছিলাম বাবা, সেই কথাটিই জান্‌তে এসেছিলাম।"—বলিয়াই বিষণ পিছন ফিরিল।

বাড়ি ফিরিতেই দেখিল তাহার একমাত্র পুত্র মন্মথ ইহারই মধ্যে স্নান করিয়াছে এবং মাথায় বেশ একটি লম্বা টেরি কাটিয়া নীলরঙের ডোরাকাটা ফতুয়াটি গায়ে দিয়া উঠানের উপর বসিয়া একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়া তাহার চটি জুতা জোড়াটি পরিষ্কার করিতেছে।

বিষণ তাহার কাছে আসিয়া বসিল। বলিল, "হাঁ বাবা মথন্, সত্যি করে' বল্ দেখি বাবা, পাঁড়ে-মশায়ের সাক্ষাতে কোনদিন গাঁজাটাঁজা খেয়েছিলি?"

"কে, আমি?"—বলিয়া মথন্ তাহার বৃদ্ধ পিতার মুখের পানে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নাঃ।"

বিষণ আশ্বস্ত হইতে পারিল না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ্, সত্যি করে' বল্ বাবা—"

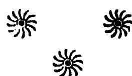
"নাঃ! মাইরি—না। তোমার দিব্যি করে'—এই ভগবতীর চামড়া ছুঁয়ে বল্‌ছি—তা কেন খেতে যাব?"

—এই বলিয়া মন্মথ তাহার জুতাজোড়াটি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল।

এত বড় শপথের উপর আর কথা চলিল না। বুড়া বাপ চুপ করিয়া রহিল।



মহাযুদ্ধের ইতিহাস



বেলা তখন প্রায় দু'পহর গড়াইয়া গেছে।

হৈমন্তিক ধান পাকিবার সময়। গ্রামের পথের উপর, পাকা-ধানের বোঝাই-গাড়িগুলা তখন হামেসাই যাওয়া-আসা করে। পথের ধূলাও উড়ে, শব্দও হয়,—দুপুরটা নিস্তব্ধ প্রায়ই থাকে না।

কিন্তু সেদিন ঠিক এমনি সময়টায় গ্রামের মধ্যে সে এক ভয়ানক গোলমাল উঠিল। গাড়ীর গোলমাল নয়—মানুষে-মানুষে মারামারি-খুনোখুনি গালি-গালাজের বিশ্রী কোলাহল। মনে হইল, শব্দটা যেন দেখিতে দেখিতে পাঁড়ে-পাড়া হইতে ধরম্-তলা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

দূর হইতে ভাল বুঝাও যায় না, অথচ,—পাঁড়ে-পাড়ার গোলমাল। ঘটনাস্থল পর্য্যন্ত আগাইয়া যে কেহ দেখিয়া আসিবে—এত বড় সাহস কাহারও নাই। যাহাদের আছে, কেহ-বা পড়ো-বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে-ফাঁকে,

কেহ-বা গাছের আড়ালে, কেহ-বা পুকুরের পাড় দিয়া খানিকটা আগাইয়া গেল; এবং অনেকেই আপন-আপন দরজায় দাঁড়াইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

এমন গোলমাল এ-গাঁয়ের লোক অনেক শুনিয়াছে।

গণেশ পাঁড়ে বলে, বাংলায় তাহাদের চৌদ্দ পুরুষ বাস করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহারা শান্তিপ্রিয় নিরীহ বাঙ্গালী নয়, কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছে,—তাহারা কনৌজ্। মারামারি-কাটাকাটি তাহাদের রক্তের মধ্যে।

এবং পূর্ব্বপুরুষের সে গৌরবান্বিত রক্তের পরিচয় তাহারা দিতে ছাড়ে না।

গণেশ পাঁড়ের বাপের আমলে তাহাদের খুড়ায়-জ্যেঠায়, আত্মীয়-কুটুম্বে প্রায় আট-দশ ঘর পাঁড়ের বাস ছিল এই গ্রামে। ঝগড়া-বিবাদের সময় লাঠিতে-হাতিয়ারে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানা এক সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িত।

গ্রাম হইতে প্রায় মাইল-খানেক্ দূরে, সরকারি একটা রাস্তার উপর, ছোট একটি নদী বাঁধা পড়িয়াছে। নদীর সেই রেলিং-দেওয়া লোহার সাঁকোটিকে মাঝে রাখিয়া,

রাস্তার দু'ধারে বহু পুরাতন প্রকাণ্ড গাছের শ্রেণী শাখায়-পাতায় পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া এম্‌নি ঘন বিন্যস্ত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত সোজা চলিয়া গেছে যে, দিনের বেলা রাস্তাটা মনে হয় অন্ধকার,—একা চলিতে গা ছম্‌-ছম্‌ করে। জায়গাটার নাম ভালুকমারার পুল। এই পুলের কাছাকাছি জংশন-ষ্টেসনের একটি রেলের লাইন পার হইয়াছে,—সেই লাইনের ফটক্‌ওয়ালা ছিল গণেশ পাঁড়ের পিতামহ। গ্রাম হইতে বুড়াকে রোজ সেইখানে যাওয়া-আসা করিতে হইত। অন্ধকার রাত্রে পথযাত্রী অনেক পথিক সেখানে মারা পড়িয়াছে,—এবং এ-সব ছিল নাকি তাহারই কাজ।

গণেশের এক কাকা নাকি ঢিল ছুঁড়িয়া পাখী মারিত। ঢিলের সন্ধান তাহার অব্যর্থ ছিল।

রজনী পাঁড়ের গায়ে চোট্‌ বসিত না।

এ-সব কাহিনী গ্রামের লোক এখনও ভুলে নাই।

মারামারি খাওয়া-খাওয়ি তাহারা চিরকালই করে। কিন্তু সে বৎসর মাত্রাটা যেন একটুখানি বেশিই হইয়া পড়িল।

সেও আজ প্রায় পাঁচ-ছ' বছর পূর্ব্বের কথা।

পাঁড়েদের সকলের ঘরেই তখন অনেকগুলা করিয়া পায়রা থাকিত। গণেশ ও কিশোরী পাঁড়ের ঘরে চাল-ধানের চিরকাল অভাব। অথচ, সুখের পায়রা,—যেখানে খাইতে পায় সেইখানেই চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে গণেশ পাঁড়ের পায়রার 'টোং' ফাঁক্ হইয়া গেল। সে ভাবিল, লোকে বুঝি তাহার পায়রাগুলি মারিয়া মারিয়া খায়।

এই লইয়া তাহাদের ঘরে-ঘরে একটা ঝগড়া বাধে: গণেশ ও কিশোরী একদিকে,—অন্যান্য পাঁচ-ছ' ঘর পাঁড়ে আর-একদিকে। মুখে-মুখে চলিতে চলিতে হাতাহাতি সুরু হয়। তাহার পর, মাস পাঁচ-ছয় ধরিয়া প্রত্যহই তাহাদের এমনি একটা-না-একটা হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ চলিতে থাকে। উভয় পক্ষই লাঠি-সোঁটা, বঁটি-কুড়ুল লইয়া বাহির হইয়া আসে, দূরে দাঁড়াইয়া গালি-গালাজ করে, ঢিল ছুঁড়ে, দু'-একটা মারপিট হয়,—আবার সব আপন-আপন ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসে। এমনই চলিতেছিল।

হঠাৎ সে-বছর গ্রীষ্মকালের চমৎকার একটি প্রভাত-বেলায় মানুষ তাহার চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিল।

নবোদ্ভাসিত অরুণের স্নিগ্ধ আলোক তখন সবেমাত্র পড়োবাড়ির আগাছার জঙ্গলে,—তাল-তেঁতুলের মাথার উপরে ঝিকিমিকি করিতেছে। আকাশ তেমনি নীল, বাতাস তেমনি স্বচ্ছ···কিন্তু ধরার ধূলা মানুষের রক্তে সেদিন রাঙা হইয়া উঠিল।

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উভয় পক্ষই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গণেশ পাঁড়ে কোথা হইতে একটা বহুকালের পুরাতন মুঙ্গেরি গাদা-বন্দুক জোগাড় করিয়া আনিয়াছিল। জনতার মধ্যে তাহাই সে সেদিন মরি-বাঁচি করিয়া চালাইয়া দিল।

শীশার ছর্‌রায় মানুষ মরিল না। জন পাঁচ-ছয় জখম্ হইয়া গেল। যাহারা হইল না, তাহাদের মধ্যে একজন ছুটিয়া গিয়া কিশোরী পাঁড়ের হাতের উপর একটা ভোঁতা কুড়ুলের চোট বসাইয়া দিল। কিশোরীর লাঠিতে একটা লোকের মাথা ফাটিল। এমনি করিয়া সেদিন একটা ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

সেদিন আর ইহার মীমাংসা ঘরে বসিয়া হইল না। সরকারি আদালতে ফৌজ্‌দারি নালিশ রুজু হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বিচার চলিতে লাগিল। আসামী সাক্ষীর এজাহার আর শেষ হয় না। সাহেব হাকিমের মাথার ভিতরটা গোলমাল হইয়া গেল। অবশেষে বছর-দেড়েক ধরিয়া এই এতগুলি লোকের হায়রাণীর পর বিচার শেষ হইল।

এক পক্ষের যৎসামান্য দণ্ড হইল। গণেশ পাঁড়ে দিন পাঁচ-ছয় জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিল। অপরপক্ষ মার খাইয়া বিচার কিনিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া খালাস পাইল।

তাহার পর মোটে ছয়টি বৎসর পার হইয়াছে।

এবং এই ছয় বৎসরের মধ্যে গণেশ-কিশোরী ছাড়া অন্যান্য যে কয় ঘর কনৌজ ব্রাহ্মণের বাস এ গ্রামে ছিল সকলেই প্রায় নির্ব্বংশ হইয়া গেছে। অবশিষ্ট আছে মাত্র কয়েকজন বিধবা। একজন গোপনে গাঁজা-বিক্রির ব্যবসা চালায়। পেটের দায়ে একজন শহরে গিয়াছিল,—কোন্ এক মাড়োয়ারীর জাঁতাকলে গম-পেশার কাজ করিত, এখন সে কি-একটা হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

একটি ঘরে দু'জন ছোকরা আছে। একজনকে ত, যুবক বলিয়া মনেই হয় না, আর-একজনের দিনে দুই বার করিয়া জ্বর আসে, অনবরত তাহাকে লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়া ঘরের এক পাশে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। আর একটি ঘর ছিল—গণেশ পাঁড়ের ঘরের প্রায় কাছাকাছি। তাহাদের শেষ বংশধর মতিলাল বহুদিন হইতে কুষ্ঠব্যাধিতে ভুগিতেছিল। গত বৎসর এম্‌নি দিনে পাল্‌শিটের মিশনারী কুষ্ঠাশ্রম হইতে লোক আসিয়া জোর-জবরদস্তি করিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে সেই-খানেই লইয়া গেছে।

তাহারই সেই ফাঁকা-বাড়ির ভাঙা প্রাচীর ডিঙাইয়া, গ্রামের কয়েকজন দুঃসাহসী যুবক আজিকার সেই পাঁড়ে-পাড়ার গোলমালের রহস্যটা জানিবার জন্য দরজার আশে-পাশে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল।

গণেশ পাঁড়ে সপরিবারে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"ইষ্টিশানের ঘাঁটি আগ্‌লে তুই বসে' থাক্ বেটা চৈতন,—বেটারা পেরোবে আর খবর দিবি। তারপর আমি দেখে নেব।"

এই বলিয়া গণেশ তাহার লোহা-বাঁধানো ছোট লাঠিখানি মাটিতে বারকতক্ ঠক্ ঠক্ করিয়া এ-হাত ও-হাত করিতে লাগিল।

গণেশের জামাতা—সুন্দরসিং চৌবে,—হিন্দুস্থানী কনৌজ ব্রাহ্মণ। আরা জেলার কোন্ একটা অখ্যাত-নামা গ্রামে তাহার বাড়ি। মজাফরপুর না কি এমনি একটা শহরের এলেকার অধীনে কোথায় কোন্ থানায় কনেষ্টবলের কাজ করে। চৌবে-মহাশয় গণেশের কন্যাকে সেখানে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে মেড়ুয়া-খোট্টার দেশে গণেশ তাহাকে পাঠায় নাই,—মেয়েও যাইতে নারাজ এবং এই কারণে শ্বশুর-জামাতায় কি-একটা মনান্তর হওয়ায় জামাই-বাবাজীর সম্ভবত রাগ হইয়াছে। বৎসরান্তে ছুটি পাইলেই একবার করিয়া অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যও এ-গ্রামে শুভাগমন হইত, কিন্তু গত বছর দুই-তিন তিনি আর আসেন না। স্ত্রী তাঁহার বিরহে দিন-দিন মোটাসোটা হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

পিতার যদি কোন সাহায্যে লাগে ভাবিয়া গণেশের

সেই কন্যাটিও দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মা বলিল :

"থাক্‌তো আমার জামাই—সুন্দর! দেখাতো মজা। দু'চারটে মাথা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি যেতো।"

নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর নামে বিরহিনী ভার্য্যার মুখে হাসি ফুটিল। কিন্তু এই বিপদের দিনে হাসিতে নাই, কাজেই সে তাহার হাসির অর্থটা একটুখানি বদ্‌লাইয়া দিবার নিমিত্ত কাকা-কিশোরীলালের দিকে তাকাইয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিল, "দেখ্ মা দেখ্, কাকা কেমন—"

কিশোরীলাল তখন ষ্টেসনের ফাটকের কাজে ভাত খাইবার ছুটি পাইয়া বাড়ি আসিয়াছে। ভাত তখনও তাহার খাওয়া হয় নাই। ব্যাপার দেখিয়া একহাতে একটা টাঙ্গি ও একহাতে একটা কুড়ুল লইয়া ভ্রাতার সাহায্যার্থে সেও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অতিরিক্ত রাগিলে কিশোরীলাল বীরের মত আস্ফালন করিয়া খুব লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করিতে থাকে,—মুখ দিয়া

তাহার একটিও কথা বাহির হয় না,—ইহাই তাহার স্বভাব। সেদিনও সে তাহাই করিতেছিল।

এমন সময় ধরমতলার দিক হইতে উপর্য্যুপরি কয়েকটা ঢিল কিশোরীলালের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িতেই তাহার সে আস্ফালন বন্ধ হইয়া গেল।

লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ ঢিল আসে।

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কিশোরীলাল একটুখানি তফাতে একটা বট্‌গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইল।

ঢিল দেখিয়া গণেশ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

"ঢিল ছোঁড়ে? লাগাও শালাদের,—মারো মারো শালাদের, ফুটাও, খুন্ করে' ফেলে দাও। ফাঁসি-শূলি হয়,—আমি দেখে' নেব, আমি দেখে' নেব, লাগাও—"

বলিতে বলিতে নিজের মেয়ে-ছেলে সামলাইয়া লইয়া গণেশ তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

এদিকে সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মতিলালের পরিত্যক্ত বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া গ্রামের যে-কয়জন ছোক্‌রা হাঙ্গামা দেখিতেছিল, ঢিল দেখিয়া তাহারাও প্রাণপণে ছুটিয়া আপন-আপন পথ দেখিল।

এবং অনতিবিলম্বেই গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, ধরম্‌তলা এবং পূব্‌-পাড়ার সমস্ত লোকের সঙ্গে পাঁড়েদের দুই ভাইয়ের ঝগড়া বাধিয়াছে, কিন্তু ঝগড়া যে কি লইয়া বাধিয়াছে, কেন বাধিয়াছে, তাহার সঠিক সংবাদ কেহই দিতে পারিল না।

একজন বলিল, "আর একটু থাক্‌লেই জানা যেতো। কিন্তু—"

"যে ঢিল্‌!"

"আর একটুখানি হলেই আমার মাথায়।"

দৌড়িয়া আসিয়া সকলেই তখন হাঁপাইতেছিল।

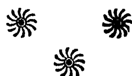
"বাপ্‌রে বাপ্‌! এ—ত বড়-বড় ঢিল্‌।"

"খুনোখুনি হলো বলে'! শোনই না!"

অনেকেই সেইদিকে কান পাতিয়া রহিল। গরুর-গাড়ির গাড়োয়ানদের বারণ করিয়া দেওয়া হইল। ধান-বোঝাই গাড়ীগুলা ডাকাইয়া তাহারা অন্যপথ দিয়া গ্রামে ঢুকিতে লাগিল।



মহাযুদ্ধের ইতিহাস



গ্রামের পশ্চিমে ছোট যে নদীটি আছে, বর্ষায় তাহার জলের রং হয়—লাল। পাহাড় হইতে গিরিমাটির ঢল নামে। নদীটির নাম—হিঙুল।

সেই হিঙুলের তীরে জমিদারের খানিকটা 'দো-জমি' বহুকালের অনাবাদী,— তাহাই চাহিয়া লইয়া শশী মোড়ল সে-বছর আলু ও পেঁয়াজের চাষ করিল।

ফসল সেখানে মন্দ ফলিত না, কিন্তু মাটি ফুঁড়িয়া আলু ও পেঁয়াজের সবুজ কলিগুলি মাথা তুলিয়া উঠিতে না উঠিতেই গাঁয়ের একপাল ছাগলে একবার খাইয়া গেল, আর-একবার কে যে খাইল তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানাই পাওয়া গেল না।

পরদিন সকালে ক্ষেত তদারক্ করিতে গিয়া শশী মোড়ল মাথায় হাত দিয়া বসিল। ছোট ছোট আলু-পেঁয়াজ-গুলি তখন সবেমাত্র মাটির রস টানিয়া বড় হইতেছিল,— তখনও তাহারা শিশু। কিন্তু ইহারই মধ্যে ক্ষেতের

ভেলি খুঁড়িয়া সেই শিশু-শস্যগুলিকে গ্রামের কোন্ দুষ্ট ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকারে চুরি করিয়া লইয়া গেছে। ফসল বলিতে মাঠে আর একটিও নাই। পরন্তু সে জমি-'সেয়াৎ' করিয়াছে। ক্ষেতের মাটি তখনও ভিজা। সেই ভিজা মাটির উপর ছেঁড়া আলুর লতা ও কচি পেঁয়াজের সবুজ কলিগুলি যেখানে-সেখানে ছড়ানো রহিয়াছে,—এবং তাহারই উপর মানুষের পায়ের দাগ তখনও পর্য্যন্ত স্পষ্ট জ্বল্-জ্বল্ করিতেছিল।

শশীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল।

হইবারই কথা।

চাষার ছেলে,—নিজের জমিজমা এক কাঠাও নাই। ভাল জমিদার। চাহিতেই তিনি এটুকু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই হাল-গরু লইয়া পাঁচবার সে এই মাটিতে চাষ দিয়াছে, সার ফেলিয়াছে। তাহার পর এতদিনের অনাবাদী ওই অতখানি পতিত জমি,—লোহার কোদাল দিয়া একহাঁটু পরিমাণ নীচের মাটি উপরে উঠাইয়া জমি পাট করিতে হইয়াছে। তাহার উপর ভেলি কাটিয়া বীজ পুঁতিয়াছে।

এতদিনের এই এতখানি শ্রমসাধ্য ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবার পরেও শশী নিশ্চিন্ত আরামে দিনগুলি তাহার কাটাইতে পারে নাই।

হেমন্তের পরিচ্ছন্ন আকাশেও কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগতই মেঘ উঠিতেছিল। সঞ্চরমান খণ্ড মেঘের সমারোহে সেদিন চাঁদের আলো হঠাৎ ঘোলাটে হইয়া গেল। শশীর আশঙ্কার আর অবধি রহিল না।

—"আর দু'দিন, আর তিনদিন পরে ভগবান্!"

মাটির নীচে বীজগুলি হয়ত তাহার পচিয়া যাইবে।

মেঘ কাটিয়া গেল।

শশীর এক-একটি দিন কাটে,—মনে হয়, যেন এক-এক বৎসর। রোজ ক্ষেতে যায়; রোজ সে ভেলির মাটি ধীরে-ধীরে সরাইয়া দেখে—।

দেখিতে দেখিতে সেদিন প্রভাতে হঠাৎ তাহার সমস্ত জমিটি সবুজ হইয়া উঠিল। আনন্দে শশীর মুখে সেদিন আর ভাত রুচিল না।

ছাগলে যেদিন পেঁয়াজের কলিগুলি খাইয়াছিল, শশী বলিয়াছিল, "থাক্—আবার হবে।"

কিন্তু আজ আর সান্ত্বনার কোনও পথই তাহার জন্য উন্মুক্ত রহিল না। শশীর চোখ দিয়া টপ্ টপ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

বাহিরের বসিবার ঘরে জমিদার একাকী বসিয়া ছিলেন।

শশী ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সীতাপতি আচার্য্য মুখ তুলিয়া চাহিতেই হাতজোড় করিয়া শশী বলিল, "হুজুর—!"—বলিয়াই সে সেইখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল,—

"চোরে সব চুরি করে' নিয়ে গেছে হুজুর, আলু পেঁয়াজ, যা-কিছু বসিয়েছিলাম—সব।"

"সব ?"

শশীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু কহিলেন, "বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে,—নাকে তেল দিয়ে ঘুমোগে যা।"

"ঘুমোইনি হুজুর,—চোরে নিয়ে গেল, এই—সবে ছোট গাছ, এখনও—"

কথাটা শুনিবামাত্র তিনি রুখিয়া উঠিলেন।

"ঘুমোস্‌নি হারামজাদা, পাজি, ছুঁচো? না ঘুমোলে চোরের বাবার সাধ্যি কি নিয়ে যায়! বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, বেরো আমার সুমুখ থেকে।"

শশী তাঁহাকে চিনিত, কাজেই সে উঠিয়াও গেল না, জবাবও দিল না, বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু জানালার বাহিরে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সুমুখে একটা পানাভর্ত্তি ছোট পুকুরের কিনারে সাদারঙের তিনটি বক লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ একটির শিকার মিলিয়া গেল। মাছটা সে দুই ঠোঁটের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া উড়িয়া যাইতেই, অন্য দুইটা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া অধিকতর সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে লাগিল।

তাঁহাকে এমনি নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শশী বলিল, "গাছ খুব পুষ্টলো হয়েছিল হুজুর—"

জমিদার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "হবে না? নদীর ওপর দো-জমি, ওর দাম কত জানিস? আস্‌ছে-বছর থেকে আমি নিজে চাষ করব সেখানে, তোরা পারবিনে, তোরা নেহাৎ আহাম্মুক্।"

শশী বলিল, "কিন্তু গাঁয়ের সব দুষ্ট লোকের দায়ে কিছু পাবেন না হুজুর।"

সীতাপতিবাবু আবার চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "পাব না কি রকম? তুই পেলিনে বলে' আমিও পাব না?—জেনে-শুনে তবে কেন গিয়েছিলি আমার জমিতে হাত দিতে? আমার হাল-গরু-মুনিষের দাম লাগে না বুঝি? আমার জমির বুঝি খাজনা নেই?—টাকা ফেল্‌—ফেলে উঠে যা বলছি বজ্জাত চাষা কোথাকার!"

রাগে একপ্রকার কাঁপিতে কাঁপিতে পুনরায় তিনি সেই জানালার পানে ফিরিয়া তাকাইলেন।

বক দুইটা তখন উড়িয়া গেছে। ভাঙা একটা পোড়ো বাড়ীর দেওয়ালের উপর প্রকাণ্ড একটা শকুনি বসিয়াছিল। নিমতলার 'ভাগাড়ে' হয়ত' গরু পড়িয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ আবার এমনি নীরবে থাকিয়া মনে

হইল যেন সীতাপতিবাবুর রাগটা খানিক্ কমিয়া আসিয়াছে।

জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "দাদার কানে যদি একবার ওঠে যে, জমি তোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি বিনা-খাজনায়, হাল দিয়েছি, গরু দিয়েছি, মুনিষ দিয়েছি, সার দিয়েছি, অথচ একটি পয়সার দাবী দাওয়া রাখিনি,—তাহ'লে আমার দশাটা কি হয় একবার ......না, না, সেকথা তোরা ভাব্‌বি কেন শশী? চুপটি করে' ঘরে গিয়ে ঘুমোগে তার চেয়ে,—কাজে লাগ্‌বে। মাগ্-ছেলে নিয়ে উপোষ ত' দিতেই হয়—এবছরটাও দে।"

অশ্রুভারে শশীর কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, অতিকষ্টে ঢোঁক্ গিলিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "পাঁচটি টাকার বীজ এনেছিলাম হুজুর—"

কিন্তু সে-কথার জবাব না দিয়া সীতাপতিবাবু কহিলেন, "ফ্রি না হয় করে দিলাম, কিন্তু ছেলেটাকে কি জন্যে মর্‌তে ইস্কুলে দিয়েছিস্? বিষণ দের ছেলেটাকে দেখেছিস? দু'পাতা পড়তে শিখে' ভাবলে বুঝি-বা লাট্-বেলাট্ই

হয়ে যায়! ও লাঙ্গল ধরবে বলে ত' আমার মনেই হয় না। এম্‌নি খিক্‌পিকে' প্যাকাটির মত চেহারা,—ধরবেই বা কার জোরে?"

ধরা-ধরা গলায় শশী বলিল, "না আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে বলাইকে আমি লাঙলও ধরাব, মাটিও কাটাব।"

সীতাপতিবাবু কহিলেন, "হ্যাঁ, হাত-পায়ের হাড়গুলো মোটা-সোটা হোক্, বুকখানা চওড়া হোক্,—মানুষ হোক্! মানুষ হোক্!"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার পকেটে হাত দিয়া কি যেন বাহির করিলেন, এবং তাহাই তিনি শশীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, "মিছেমিছি আমার কপালে এই দণ্ডটি ছিল।"

পাঁচ টাকার একটি নোট দেখিয়া শশী প্রথমে থতমত খাইয়া গেল। কি যে বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। বলিল, "টাকা আমি···আজ্ঞে হুজুর···টাকা···আপনার শ্রীচরণে···আমি···"

"চাইনি। কেমন?—বেশ, দরকার না হয় ফিরে

দিয়ে যাও। তবে আর মুখ্যু চাষা বলেছে কাকে? কাল্‌কেই আবার সেই আমার দুয়োর ভিন্ন গতি নেই বাবা!—বীজের দরুণ পাঁচ-সাতটি টাকা আমার লোকসান হলো হুজুর, মেয়ে উপোস, ছেলে উপোস, বৌ কাঁদছে—"

বলিয়াই তিনি একবার দরজার দিকে তাকাইলেন।

সুমুখের ছোট বাগানটির এককোণে, কাগ্‌জি-লেবুর একটা গাছে সে-বছর বিস্তর লেবু ধরিয়াছিল। কিন্তু মজা এই যে—সুযোগ এবং সুবিধা পাইলেই যে না আলস্য করে, সে-ই দুটা ছিঁড়িয়া লইয়া ঘরে চলিয়া যায়।

পণ্ডিত-গিন্নির পাশেই ঘর,—সুবিধা তাহারই সব চেয়ে বেশি। দিন নাই, রাত নাই, লেবু খাওয়াটা তাহার ঘরে খুব জোর চলিতেছিল। সে-দিন সে হাতে হাতে ধরা পড়িবামাত্র হ্যা হ্যা করিতে লাগিল। অসংবদ্ধ অর্থহীন ভাষায় নিজের দোষ ঢাকিবার চেষ্টাও সে কম করে নাই। বলিল, "ছোট ছেলেটার অসুখ বাবা··· তোমারই খাই, তোমারই পরি, এ আর বেশি কথা কি,

—ইষ্টিশানের খোঁড়া-ডাক্তারকে দেখালাম, গাছের ফল, তাই বলি দুটো···এ আর—"

সীতাপতিবাবু সেদিন তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন নাই। বলিবার আছেই-বা কি!

আজ আবার সেই পণ্ডিত-গিন্নিকেই বাগানের দরজায় ঢুকিতে দেখিয়া শশীর সহিত কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "চুরি করে' নেওয়া কেন বাপু, দু'চারটে দরকার, চেয়ে নিলেই ত' হয়!"

কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথাটা বলা হইল সে তখনও দূরে। কাজেই জবাব দিল শশী।

হাত জোড় করিয়া বলিল, "চুরি? আজ্ঞে আমি ত জীবনে···কস্মিন্‌কালেও···"

"তোকে বলিনি।"

শশী পিছন ফিরিয়া দেখিতে যাইতেছিল, কিন্তু পণ্ডিত গৃহিণী তখন চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সীতাপতিবাবু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

পণ্ডিত-গিন্নির মিশি-ছোপানো কালো রঙের দুই

পাটি বড় বড় দাঁত সর্ব্বপ্রথমে বাহির হইয়া পড়িল; তাহার পর সে তাহার দড়ির মত পাকানো হাত-দুইটি নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি আমাদের কোলে-পিঠে মানুষ-করা ছেলে সীতেনাথ, অধম্ম তোমাকে আমি করতে দেব না কখনও।"

তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার জন্য পণ্ডিত-গৃহিণীর দরদী অন্তঃকরণে সহসা আজ এত বেশি মমতাবোধ কেন যে এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল—সীতাপতিবাবু সেকথা বুঝিলেন, কিন্তু বুঝিয়াও তাহাকে সব কথা বলিবার অবসর দিয়া নিজে চুপ করিয়া রহিলেন।

পণ্ডিত-গিন্নি বলিল, "আমাদের গুষ্টি হলো পণ্ডিতের গুষ্টি। দুগ্যো-বাংলার পাঠশাল্ আমাদের হকের জিনিষ; —চোদ্দ পুরুষ ধরে' ওই পাঠশাল্ আমাদের। দেবেন ছাড়া ওখানে আর-কেউ ছেলে পড়াতে পাবে না, তা আমি বলে' রাখ্ছি বাবা!"

এই বলিয়া জবাবের জন্য একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিতে লাগিল. "কেন, ছেলেবেলায় পড়নি

আমাদের দেবেনের বাপের কাছে? লেখাপড়া তোমরা শিখ্‌লে কোথা? সেই তারই দৌলোতে। সে আজ বেঁচে থাক্‌লে—"

বলিতে বলিতে পণ্ডিত-গিন্নি চট্‌ করিয়া এক খাম্‌চা কাঁদিয়া লইয়া চোখের জল মুছিয়া নাক ঝাড়িয়া আবার তেম্‌নি দিব্য সহজ গলায় কহিল, "আমার শ্বশুরের কাছে পড়েছে তোমার দাদা। আর আমার শ্বশুরের বাপের কথা না হয় ছেড়েই দাও, তিনি ছিলেন ল্যায়নঙ্কা, তেমন পণ্ডিত ক'জন মেলে? এক-এক কাজ-কর্ম্মে যেতেন আর এম্‌নি বড় বড় পিতলের ঘড়া-কলসি, চাদর-গামছা ভিন্ন ঘর ঢুকতেন না,—আর সে-সব কাপড় কি,—সে-সব ঘড়া কি! তার হাতের লেখা তালপাতার পুঁথি এখনও গাদাবন্দি গোঁজা রয়েছে আমার রান্নাঘরের চালে। তার একটি আথর্‌ উঠোয় এখন কার বাবার সাধ্যি!"

আর ভাল লাগিতেছিল না, সীতাপতিবাবু বলিলেন, "তোমার দেবেন ছেলে-পড়াবার কিচ্ছু জানে না, তাই গাঁয়ের পাঁচজনা মিলে রাশু ভট্‌চাজ্‌কে পাঠশালাটি দিয়েছে,—বুঝলে?"

রাশু ভট্‌চাজের নাম শুনিয়া পণ্ডিত-গিন্নি জ্বলিয়া উঠিল।

বলিল, "আমার শ্বশুরের গদিতে শেষকালে বস্‌লো কিনা ওই রেশো? ছেলে পড়াতে আমার দেবেন জানে না—জানে তোমার ওই রেশো ভট্‌চাজ্? ও মা আমার কে রে! কই, বলুক দেখি আরও দশজনা,—গাঁয়ের ছেলেরা কাকে ভয় করে? রেশোকে, না আমার দেবেনকে? দেবেনকে দেখ্‌লে ছেলেরা সব কাপড়ে মোতে, তা জানো?······ওই আমার উঠোনের কুল গাছটি ত দেখেছ?—পাকা কুল সেই চোত্-বোশেখ্ পর্য্যন্ত থাকৃবে। কেন, কই, পাড়ার ছেলের দৌরাত্ম্যিতে আর কারও গাছে থাকে? দেবেনের ভয়ে ছেলেরা আমার দুয়োর মাড়ায় না।······আর—আমাদের যুগ্‌লী, দেবেনের চেয়ে বড়ই ত? দিদি হয়। কিন্তু কই, আমার দেবেনের সাক্ষাতে রা'টি কাড়ুক্ দেখি ঘরে? তরকারি কই এতটুকু কম দিক্ দেখি পাতে?"

পণ্ডিত-গিন্নি সহজে হঠিবার পাত্রী নয়। কি বলিয়া যে তাহাকে বুঝাইয়া বিদায় করিবেন সীতাপতিবাবু

তাহাই ভাবিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর বেশিক্ষণ ভাবিতে হইল না।

সুমুখে রাস্তার উপর অনেকক্ষণ হইতেই সমবেত কয়েকজন মনুষ্যকণ্ঠের কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একটা উন্মত্ত জনস্রোত তাঁহার সেই ছোট বাগানের পথ ধরিয়া হুড়মুড়্ করিয়া একেবারে তাঁহার দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য সীতাপতিবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যে-দৃশ্যটি সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহাতে এই নিরীহ নির্ব্বিরোধ মানুষটির একটুখানি চমকিয়া উঠিবারই কথা।

বিক্ষুব্ধ সেই জনসঙ্ঘের সর্ব্বাগ্রে রাথহরি পাঠকের দুইহাতে দুইজন ধরিয়া ধরিয়া হাঁটাইয়া আনিতেছিল, মাথাটা তাহার ফাটিয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ। মাথার ক্ষতস্থান হইতে তখনও পর্য্যন্ত ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁচা রক্ত ঝরিতেছিল। মুখের উপর রক্তের দাগ কালো রং ধরিয়া জমাট্ বাঁধিয়া গেছে।

হরেকিষ্ট তাঁতিরও সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত,—কয়েক জায়গায় কয়েকটা আঁচড়ের চিহ্ন তখনও বর্ত্তমান।

কাহারও সহিত মারা-মারি হাঙ্গামা যে একটা-কিছু হইয়াছেই এবং কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পাঁড়েপাড়ার যে গোল-মাল তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন তাহাও যে ইহাদের লইয়াই, সে কথা বুঝিতে সীতাপতিবাবুর অধিক বিলম্ব হইল না।

রাখহরি তাহার ফাটা মাথা লইয়াই তাঁহার পায়ের কাছে সটান্ লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

—"রক্ষা করুন হুজুর! আপনি আমাদের মা-বাপ, আপনি রাজা,—আপনি রক্ষা করুন!"

হরেকৃষ্টও সেইসঙ্গে তাঁহার পা-তুইটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ,—আপনিই……"

কিন্তু কি হইয়াছে, কেন যে তিনি তাহাদের রক্ষা করিবেন এবং এই রক্তারক্তি মারামারির হেতুটাই বা কি, তাহার সঠিক্ সংবাদটি জানিবার জন্ম উদ্‌গ্রীব হইয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার প্রশ্ন করিবার পর, হরেকৃষ্ট তাঁহার পা তুইটি ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, এবং

৬

এই সর্ব্বনাশের হেতুটি যে কি, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার নিমিত্ত বারকতক্ ঢোঁক্ গিলিয়া নিজেকে প্রথমে প্রস্তুত করিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "শুনুন্ তবে আজ্ঞে! নিবেদন পাই।"

এই বলিয়া তাহার ভণিতা স্থরু হইল।

তাহার পর, সে যে কেমন করিয়া গণেশ পাঁড়ের মাথাটা চেলাইয়া দু-ফাঁক্ করিয়া দিতে পারে, এবং কিশোরী পাঁড়ের স্থূল উদরের পুরু চামড়াটি কাটিয়া তাহার ভিতর হইতে নাড়িভুঁড়িগুলি যে কি-প্রকারে মাত্র মিনিট-কয়েকের মধ্যেই টানিয়া বাহির করিতে হয়,—রাগের মাথায় তাহারই ইতিহাস সর্ব্বপ্রথমে সে সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল।

অসহিষ্ণু হইয়া সীতাপতিবাবু তাহাকে জোরে এক ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চোপ্ হারামজাদা পাজি ছুঁচো, চোপ্! ও-সব শুন্তে চাইনে তোর কাছে,—কি হয়েছে তাই বল্, নইলে—উঠে' যা এখান থেকে—ভাগ্!"

চোখের উপরের খানিকটা রক্ত হাত দিয়া মুছিয়া

ফেলিয়া রাখহরি এইবার উঠিয়া বসিল। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "আমি বলি। তুই চুপ্ কর্ হরেকিষ্ট!"

হরেকিষ্ট হাতজোড় করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

রাখহরি যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, গত কয়েকদিন হইতে উপর্য্যুপরি তাহার মাঠের পাকা ধান চুরি যাইতেছিল। যাই যাই করিয়া মাঠের দিকে একদিনও তাহার যাওয়া হয় নাই। কিন্তু আজ সে হঠাৎ মাঠে গিয়া দেখে যে, গণেশ পাঁড়ের বড় ছেলে চৈতন, নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহারই মাঠের উপর গরু চরাইতেছে এবং কতক্‌গুলা পাকা ধান কাস্তে দিয়া কাটিয়া ঘরে লইয়া যাইবার জন্য ক্ষেতের একপাশে আঁটি বাঁধিয়া গাদা করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই সহিত প্রথমে দু'এক কথা বলা-কওয়া হয়। কিন্তু চৈতন কিছুতেই শোনে না—গরু সে চরাইতেই থাকে। নিরুপায় হইয়া রাখহরি তখন জন-দুই-তিন লোককে সাক্ষী রাখিয়া নালিশ করিবার জন্য আদালতে যাইতেছিল। পাঁড়ে-পাড়ার রাস্তায় গণেশের সঙ্গে দেখা। চৈতন ইতিমধ্যে ঘরে ফিরিয়া তাহার বাবাকে

সংবাদ দিয়াছে। গণেশ পাঁড়ে চোখ লাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাস্?" রাখহরিও রুখিয়া জবাব দেয়, "আদালতে। তোমার নামে নালিশ কর্‌তে।" কথাটা শুনিবামাত্র লাঠি হাতে লইয়া সে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। রাখহরি বলিল, "কি রকম?"

"এই রকম।"—বলিয়া গণেশ পাঁড়ে তাহার হাতের লোহা-বাঁধানো লাঠি দিয়া প্রথমেই এক লাঠি এইখানে মারে।

হাত দিয়া রাখহরি তাহার রক্তাক্ত মাথার ডান-দিকটা দেখাইয়া দিল।

"তারপর এইখানে।"—বলিয়া রাখহরি তাহার অঙ্গের আর-একটা স্থান দেখাইতে যাইতেছিল, হরেকিষ্ট বলিল, "আর কিশোরী? চৈতন? ওদের নাম করলে না যে ঠাকুর?"

ঘাড় নাড়িয়া রাখহরি বলিল, "হাঁ, ওরাও।"

হরেকিষ্ট তখনও হাতজোড় করিয়াই ছিল। বলিল, "আবার বলে কি-না থানা-আদালতের নাম করেছিস

কি খুন করেছি। চৈতন, তুই খাঁটি আগ্‌লে বসে' থাক্, এইদিকে শালারা পেরোবে কি আমায় খবর দিস্।"

সীতাপতিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোকেও মেরেছে নাকি? তুই কোথায় ছিলি?"

তৎক্ষণাৎ অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত হরেকিষ্ট কহিল, "আজ্ঞে আমি ত সঙ্গেই। আমিই ত সাক্ষী।—আমাকে যৎপরনাস্তি,—এইখানে, এইখানে, এইখানে আর এইখানে।"—বলিয়া সে তাহার ধূলি-ধূসরিত অঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই মারের দাগ দেখাইয়া দিল।

সীতাপতিবাবু একবার সুমুখের পানে তাকাইলেন। গ্রামের বিস্তর লোক সেই ছোট বাগানখানির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাছপালাগুলি বুঝি আজ আর থাকে না!

হরেকিষ্ট বলিল, "উল্টো বলে কিনা ডিমওয়ালার কাছ থেকে আমরা টাকা কেড়ে নিয়েছি—"

কিন্তু সীতাপতিবাবু সেকথা শুনিতে পাইলেন না। সম্মুখে জনতার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তোরা কি

জন্যে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে আছিস্ বাপু?—যা বাড়ী যা। বাড়ী যা সব,—এখানে কি আছে তোদের ?"

কেনারাম মুখুজ্যে পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। জমিদারের কাছে ডিমওয়ালার কথাটা পট্ করিয়া বেফাঁস্ বলিয়া ফেলা হরেকিষ্টর উচিত হয় নাই। কাজেই ইঙ্গিতে-ইসারায় সে-কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য হরে-কিষ্টর মুখের পানে তাকাইয়া কেনারাম বারকতক্ তাহাকে চোখ টিপিল। কিন্তু চোখের পাতাদুইটা যাহার দিনরাত উঠা-নামা করে, তাহার চোখ টেপা না-টেপা দুই-ই সমান।

হরেকিষ্ট আবার কি যেন বলিতে যাইতেছিল।

কেনারাম তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে ছেড়ে' দাও—ছেড়ে' দাও, ও-কথা ছেড়ে দাও। দোআনি দুটি ত' এখনও আমার কোঁচড়ে-কোঁচড়েই ফিরছে, কি যে করব, কাকে যে দেব, তা ত' ভেবেই পাই না ছাই!"

সীতাপতিবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কিসের দু'আনি? কার? কাকে দিতে হবে?"

কথাটাকে তৎক্ষণাৎ উড়াইয়া দিয়া কেনারাম বলিল, "ও-ই এক-বেটা ইষ্টিশানের মেড়ুয়া দিয়ে গিয়েছিল পদ্মরাজের পেনামী—পূজোর জন্যে যৎসামান্য কিছু—। আর, তো-বেটার আচ্ছা আক্কেল যাহোক্, বেটা তাঁতি কিনা! বল্‌লেই হলো অম্‌নি লোকের নামে দোষ দিয়ে যা-তা! গণ্‌শা না-হয় বজ্জাতই ধরে' নিলাম,—তাই বলে' কি......আরে এই! তোরা কি দিবি আজ বাগান-টাকে ভেঙে? না, কী মনে করেছিস কি? এ কি ভালুক-নাচ, না বাঁদর-নাচ, যে, সবাই মিলে দেখ্‌তে এসেছিস্ ছুটে'?"

এই বলিয়া খানিক্‌টা চেঁচাইয়া সীতাপতিবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া চুপি-চুপি কহিল, "তাহ'লে এখন কি করা যায় বল দেখি ভায়া? মেয়েছেলে নিয়ে গাঁয়ে বাস করা—এ যে একটা—"

কথাটা তাহার আর শেষ হইল না। এতবড় গুরুতর সমস্যার চিন্তায় মুখখানি তাহার দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত ম্লান হইয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে চোখের পাতাদুইটিও খুব ঘন-ঘন ওঠা-নামা করিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "করবে আবার কি? ঘরে ঘরে মিটিয়ে নিতে পার নাও, নইলে নালিশ করে' এসো।"

হরেকিষ্ট হাতজোড় করিয়াই বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, নালিশ আমরা ও-বেটার নামে একনম্বর ঠুক্‌বই।"

সীতাপতিবাবু পুনরায় ভিতরে গিয়া বসিতেছিলেন, কেনারাম বলিল, "নালিশ ত' করবে, কিন্তু যায় কেমন করে?—পেরোবে কেমন করে? ওরা যে ওৎ পেতে বসে' আছে।"

কেনারামের কথাটা শুনিয়া তিনি রাগিয়া উঠিলেন বলিলেন, "আমি কি নিজে গিয়ে পার করে' দিয়ে আসব না কী মতলব তোমাদের?"

কেনারাম খানিকটা জিব বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "রাম বল। তাই কি আর বলতে পারে কেউ? তবে কিনা এই একটা চাপ্‌রাশী-টাপ্‌রাশী, দু'একজন লোক………"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরা মারামারি ফুটোফুটি কর, আর আমি লোক জুগিয়ে মরি! নিয়ে—

দিক্ বেটা আমাকেও এই সঙ্গে গেঁথে! বলিহারি বুদ্ধি যাহোক্ তোমাদের! না—না, ও-সব হবে-টবে না, ও-সব হবে না আমার কাছে। তোমরা যা-খুশী তাই কর,—মারামারি হাঙ্গামাতে আমি নেই।"

এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ তিনি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সেই জানালার পানে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দাদা যদি একবার শোনে একথা, তা'হলে অপমানের আর বাকি থাকবে না কিছু।—ভয়েই যদি মরতে হবে জানিস্, ত' কী দরকার ছিল তোদের মারামারি করতে যাবার—বল্ দেখি বাপু? ও বেটা চোয়াড়, ও বেটা ছোটলোক, ও সব পারে, ও খুন করতে পারে!"

বেগতিক দেখিয়া রক্তাক্ত কলেবরে রাখহরি নিজেই তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "পড়ে' পড়ে' মার খেতে হয় তাহ'লে হুজুর, নালিশ-মোকর্দ্দমা আর হয় না।"

অনেকক্ষণ হইতেই সীতাপতিবাবু রাখহরির মুখের পানে তাকাইতে পারিতেছিলেন না, এইবার মুখ তুলিয়া তাহার সেই রক্তরঞ্জিত শুষ্ক মুখখানার দিকে তাকাইতেই

তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

"আঃ! জ্বালালি দেখ্‌ছি তোরা আমায়! যা তবে তাই, যা আমার ছেলের কাছে, সে-ই সব ঠিক করে' দেবে, বল্‌বি তোমার বাবা বল্‌লে, যা।—ওরে কে রয়েছিস্? নবীন কোথায়, নবীন কোথায় জানিস্ কেউ?"—বলিয়া একবার তিনি বাহিরের দিকে তাকাইলেন।

কৌতূহলী দর্শকের মধ্যে কতকগুলা ছেলে তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। কে একজন বলিয়া উঠিল, "নবীন-দা ইস্কুলে!"

ছেলেটাকে কাছে ডাকিয়া সীতাপতিবাবু বলিয়া দিলেন, "বল্‌গে যা—তোমার বাবা বল্‌লে, দু-জন চাপরাসী আর একজন চৌকিদার বেশ জোয়ান্ দেখে'—বেশ করে' বলে দেয় যেন তাদের,—ফের্ যদি রাখুর গায়ে কেউ হাত তুল্‌তে আসে ত'......আচ্ছা যা, নবীনকে সে-সব কিছু বল্‌তে হবে না, বলে' সে দেবেই।"

স্কুলঘর বেশী দূরে নয়। দূরের সে পুরাতন ইস্কুলটি এখন নূতন ঘরে উঠিয়া আসিয়াছে। যিনি ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন দরিদ্র, এবং বোধ করি সেই কারণেই তাঁহার মৃত্যুর পর ইস্কুলটিরও মরিবার জো হইয়াছিল,—সম্প্রতি তাহাই আবার বাঁচিয়া উঠিয়া নবজীবনের প্রবল ধাক্কায় ধুক্ ধুক্ করিতেছে।

জমিদারের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরের পাশে পরিত্যক্ত একটি ভিটের উপর গন্ধ-গোকুল ও ফণীমনসার জঙ্গল কাটিয়া নবীনের উৎসাহে কয়েকটি চুনকাম্‌করা খড়োঘর তৈরী হইয়াছে; স্বর্গগত প্রতিষ্ঠাতার বড় ছেলেটি পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে শহরের আপিসে কেরাণীর কাজ ছাড়িয়া হেডমাষ্টারীতে বহাল হইয়াছেন; আর-একটি ছেলে তাঁহার দূরের এক কয়লা-কুঠিতে হারমোনিয়াম ও বাঁশী সারানোর দোকান খুলিয়াছিল, শিক্ষকতা করিবার জন্য

সেও গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। গ্রামেরই এমনি আরও কয়েকজন ছোকরা লইয়া স্কুলটি এখন কোন-রকমে টিম্‌টাম করিয়া চলে।

সেকেণ্ড্‌-পণ্ডিত ভট্‌চাজ্‌-মানুষ, ভিন্ন-গ্রামের কয়েকজন পয়সাওয়ালা চাষা তাঁহার যজমান। তিনি স্পষ্টই বলেন—

"আট-আনার পণ্ডিতী করতে গিয়ে দুটাকার যজ্‌মান ত' আমি ছাড়তে পারি না নবীন!" এবং কি-একটা শ্লোক আওড়াইয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে তিনি ইহাও বলেন যে, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী থাকিতে বলদ দোহন করিবার পেশা তাঁহার নয়।

ইহার উপরে আর কথা চলে না। নবীনই গিয়া তাঁহার ফাঁকা-ক্লাসের ভাঙা চেয়ারখানি দখল করিয়া বসে; ছেলেদের গল্প শুনায়।

ঘণ্টা বাজিয়া গেলেও ছেলেরা উঠিতে চায় না, বলে, "তারপর—সার্‌—তারপর?—"

নবীন ধমক দিয়া বলে, "তারপর জ্যামিতি।"

ছোট ছেলে,—গল্প শুনিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারে

না, নিতান্ত অনুনয়ের স্বরে দু'একজন বলিয়া উঠে, "না সার্, জ্যামিতি নয়,—আপনি।"

হাসিতে হাসিতে নবীন পুনরায় গল্প করিতে বসে।

হেড্পণ্ডিত মহাশয় বাহিরে চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া তামাক টানিতে টানিতে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেন। ছেলেরাও অঙ্ক-জ্যামিতির হাত হইতে সেদিনের মত বাঁচিয়া যায়।

সেকেণ্ড-পণ্ডিতের যজ্মান-ঘরে জাঁকালো-রকমের একটা অন্নপ্রাশন ছিল। ছেলেরা তন্ময় হইয়া মহাভারতের গল্প শুনিতেছে। এমন সময় সীতাপতিবাবুর পাঠানো সেই ছেলেটা নবীনের কাছে সেদিনের সেই দুর্ঘটনার সংবাদটি বহন করিয়া আনিল, এবং সকলেই যে তাহার অপেক্ষায় অদূরে রাস্তার উপর শিবমন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে সে-কথাও তাহাকে জানাইয়া দিল।

পাঁড়ে-পাড়ার গোলমাল সে শুনিয়াছিল, কিন্তু এমন যে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া যাইবে তাহা সে ভাবে নাই। তৎক্ষণাৎ সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেরা গোলমাল করিতেছিল, খুব জোরে একটা ধমক দিয়া নবীন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

তাহাকে দেখিবামাত্র রাখহরি হাউমাউ করিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল,—

"—এই হলো ভায়া, তোমার জমিদারীতে বসে' শেষপর্য্যন্ত মারই খেয়ে এলাম।"

কেনারাম বলিল, "যাহোক্ এর একটা-কিছু কর বাপ্।"

আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা হরেকিষ্ট সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

দুইজন চাপরাশী ডাকাইয়া নবীন বলিল, "যাও, তোমরা এক্ষুনি নালিশ করে' এসো।"

চাপরাশীদের বলিয়া দিল, "মহতাপ্, ফের্ যদি ওরা মারামারি করতে আসে, আমার হুকুম নেই বলে ফিরে এসো না যেন।"

"যো হুকুম মহারাজ!"—বলিয়া চাপরাশী দুজনেই সেলাম করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

"শুধু সেলাম ঠুকুলে চলবে না মহতাপ, গাঁয়ের ভেতর এসব বড় সুবিধের ব্যাপার নয়।"

পথের ধারে জমিদারী-কোটাল হাত-জোড় করিয়া বসিয়া ছিল, নবীন বলিল, "তোমার চাকুরী আর থাকে না কোটাল!"

কোটাল বলিল, "হুজুর—"

"হুজুর নয়। দিনে-দুপুরে লোকের ধান চুরি যাবে, পাকা ধান গরুকে খাইয়ে দেবে,—এসব চলবে না, চলতে পারে না।"

"পাঁড়েদের সঙ্গে হুজুর—"

নবীন বলিল, "সেই জন্যেই ত বলি—চাকুরীতে জবাব দাও।"

এমন সময় কপিল চক্কোত্তি চাকু ছুরি দিয়া বাঁশের একটা কঞ্চি কাটিতে কাটিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসিল। দুপুর বেলাটা প্রায়ই তাহাকে এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়। থার্ড-পণ্ডিত ছেলে ঠেঙাইতে ওস্তাদ, ছেলেদের পিঠে এমন নির্ম্মমভাবে ছড়ি ভাঙিতে আর কেহ পারে না। রোজ তাহার দু'তিনটি নূতন ছড়ির

প্রয়োজন হয়। এবং সে ছড়ি জোগায়—কপিল। ছেলেরা মার খায়, কাঁদে; কপিল তাহাই দেখিবার জন্য একটি বেঞ্চের একপাশে গিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে,—দেখে, আর হাসে। এমন-কি নিত্য নূতন ছড়ি কাটিয়া দিবার জন্যই কিছু চাল বিক্রি করিয়া ষ্টেশনের কোন্ এক মনোহারীর দোকান হইতে কপিল সেদিন ওই ঝক্ঝকে ধারালো ছুরিখানি কিনিয়া আনিয়াছে।

কেনারামকে দেখিবামাত্র ছুরি বন্ধ করিয়া কপিল তাহার হাতের কঞ্চিখানা নাচাইতে লাগিল।

"—পড়া হয়নি কেন শূয়ার, পড়া করিস্‌নি কেন? নে—হাত পাত্! হাত পাত! পেতেছিস্?"

বলিয়াই কপিল তাহার হাতের ছড়িটা শিবমন্দিরের ইঁট-বাঁধানো শানের উপর চড়াম্ চড়াম্ করিয়া বারকতক্ বসাইয়া দিয়া আপনমনেই বলিতে লাগিল, "বল্ এবারে বল্—কেনা, কেনৌ, কেনাঃ! কেনাম্, কেনৌ, কেনাঃ! কেনেন, কেনেভ্যাম্, কেনেভ্যঃ! বাস্ ছুটি,—যা চলে যা।"

ছড়ি নাচাইতে নাচাইতে রাস্তার লোকজনের ভিড়

ঠেলিয়া কপিল আপনমনেই কিয়দ্দূর চলিয়া গেল। কিন্তু এই যে এতগুলা লোক এখানে কেন জড় হইয়াছে, রাখহরির মাথাই বা ফাটিল কিসের জন্য, সে-সব বিষয় জানিবার কোনপ্রকার আগ্রহ-ঔৎসুক্যই তাহার দেখা গেল না।

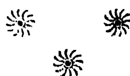
কিয়দ্দূর গিয়া আবার সে সেইখানেই ফিরিয়া আসিল। লোকজন সঙ্গে লইয়া আদালতে যাইবার জন্য তাহারা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কপিল হয়ত এতক্ষণ রাখহরিকে দেখিতে পায় নাই, এইবার সেইদিকে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, "এই যে! বা! আচ্ছা হয়েছে রেখো, তোর আচ্ছা হয়েছে। যেমন কম্ম তেমনি ফল,—পড়া হয়নি কেন শূয়ার! কেন তোর পড়া হয়নি সেই কথাই আগে শুনি।"

বলিতে বলিতে কপিল পুনরায় সেই স্কুলঘরের থার্ড-পণ্ডিতের ক্লাসটিতে গিয়া ঢুকিল।



৭



জমিদারের চাপ্‌রাশী মহতাপ্ সেদিন পাকা ধানের ক্ষেত হইতে গণেশ পাঁড়ের দুইটি গরু ধরিয়া আনে।

নবীন বলিল, "দিয়ে এসো খোঁয়াড়ে।"

মক্‌বুল মিঞার খোঁয়াড় ঠিক পাঁড়ে-পাড়ার পাশেই। হাতে একটা লম্বা লাঠি লইয়া মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া মহতাপ্ গরু দিতে গেল।

মক্‌বুলের ঘরের সুমুখে বাঁশ-বাঁখারি দিয়া খানিকটা জায়গা ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে, দিনের রৌদ্রে এবং রাত্রির হিমে অপরাধী গরু-বাছুরগুলা সেই ফাঁকা জায়গাটায় আটকানো থাকে, জলে-গোবরে দিনরাত সেখানে কাদা প্যাচ্-প্যাচ করে, বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ ওঠে, মশা ও মাছির ভ্যান্-ভ্যানানিতে মানুষ সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

পাশেই তাহার ছোট ভাই ইয়াসিনের ঘরের চালার

চতুর্দ্দিকে ছোট-বড় নানারকমের চটের পর্দ্দা ঝোলে, কয়েকটা পোষা-মুরগী চারিদিকে কঁ্যাক্ কঁ্যাক্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং সেই চটের পর্দ্দার অন্তরাল হইতে দিনরাত একটা হাত-সেলাইএর কল-চালানোর একঘেয়ে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

ঘরের এই আব্রু সম্বন্ধে এত বেশি সতর্ক ইয়াসিন পূর্ব্বে কখনও ছিল না, কিন্তু মক্‌বুলের সঙ্গে কতকগুলা চুরি করা চামড়ার ভাগ লইয়া সম্প্রতি একটা মামলা-মোকর্দ্দমা হওয়ার পর হইতে ইয়াসিনের ঘরে চটের পর্দ্দার সংখ্যা যেন কিছু বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ইয়াসিন মিঞা সেকথা স্পষ্টই স্বীকার করে। বলে, "হাজার হোক্ মেয়েটার বয়েস হয়েছে কর্ত্তা, আর ওই মেয়েটাই চব্বিশ ঘণ্টা চালায় বসে' সেলাইএর কাজ-টাজ করে,—ঘরে সব-সময় থাকি-না-থাকি······ভাই হলেও ও শালাকে আমি বিশ্বাস করি না······হ্যাঁ—।"

কিন্তু মক্‌বুল তাহার বাঁখারি-ঘেরা খোঁয়াড়ের পাশে বসিয়া ফর্‌সির নলে খাশ্-অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ছাড়ে, শহরের বাদশাহী জরদা-দেওয়া পান চিবায়,—এ সব

ছোট কথায় কান দিবার মত অবসর এখন আর তাহার প্রায়ই থাকে না।

বিশেষ করিয়া বৎসরের মধ্যে ধান কাটিবার এই সময়টায় মকবুল মিঞার মেজাজ পাওয়াই দায় হইয়া ওঠে। নূতন খড়ের আশায় পুরানো খড়গুলি অনেকেই তখন বিক্রি করিয়া ফেলে, গরু-বাছুরের দুর্ভিক্ষ সুরু হয়, গ্রামের দক্ষিণে গোচারণের মাঠটিকে ত' রেল-ষ্টেশনের ইমারত-অট্টালিকা, দোকান-দানি আর কল-কারখানার মাঝে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না,—ক্ষুধায় আর্ত্ত শীর্ণ কঙ্কালসার গরুবাছুরগুলা একবার ছাড়া পাইবামাত্র হাঁ হাঁ করিয়া লোকের পাকা ধানে গিয়া লাগে। খোঁয়াড়ে টাকা-পয়সার আমদানি হইতে থাকে,—মকবুলের ষোল-আনা পড়্‌তা পড়িয়া যায়।

এখন আর তাহার দু'চার আনা পয়সা গায়েই লাগে না।

মহতাপ্‌ গরু লইয়া অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া ছিল। পানের খানিকটা পিক্ ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া মকবুল বলিল,

"গণেশ পাঁড়ের গরু নেবার বহুৎ হাঙ্গামা সিং-জি! মাপ কর,—ও আমি নিতে পারব না।"

মহতাপ্ জিজ্ঞাসা করিল, "কেনো লিবে না শুনি?"

মকবুল আবার খানিকটা পিক্ ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "পয়সা দেয় না, উল্টো জবরদস্তি মারপিট্ করতে আসে। ও নিয়ে আমার লাভ কি?"

এই বলিয়া সে তাহার ফর্সির নলে বারকতক্ টান দিল। বলিল, "তার চেয়ে সিধা বাৎ বলি,—এইপথে ইষ্টিশনের খোঁয়াড়ে দিয়ে এসো—যাও।"

মহতাপ্ গরু লইয়া ষ্টেশনেই যাইতেছিল, ইয়াসিন তাহাকে ফাঁকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলে কি?"

মহতাপের জবাব শুনিয়া সে তাহার ঠোঁট দুইটি উল্টাইয়া কহিল, "ভয়-তরাসে' মানুষের সাহস কোথা পাবে সিং-সায়েব? আসছে-বছর আমি খোঁয়াড় ডাক্‌ব —নিলেমে। গরু যত পার দিও তখন। কাউকে 'কেয়ার্' করি না আমি—আমি কাউকে ভয় করি না।"

গরু যে তাহার চালান গিয়াছে গণেশ পাঁড়ে আগেই সেকথা টের পাইয়াছিল। ষ্টেশনের পথে একা পাইয়া মহতাপ্‌কে আগ্‌লাইল,—গণেশ, কিশোরী ও চৈতন। মারপিট্‌ করিয়া গায়ের জোরে গরু ছিনাইয়া আনিল।

মহতাপ্‌ অম্‌নি ছাড়িল না; লাঠি দিয়া চৈতনের একটি হাত সে রীতিমত জখম্‌ করিয়া দিল।

ঘরে গরু রাখিয়া গণেশ তৎক্ষণাৎ চৈতন ও কিশোরীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং সেইদিনের খোলা-কাছারিতে এই বলিয়া নালিশ রুজু করিল যে, জমিদার ও তাহার ছেলে নবীন, অনেক লোক-লস্কর লইয়া সেদিন সদলবলে তাহার ঘর লুট করিতে আসে; এবং লুট-তরাজ না করিতে পাইয়া তাহাকে ও তাহার ছেলে চৈতনকে যৎ-পরোনাস্তি প্রহার করিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যায়। অত্যা-চারী জমিদার অত্যন্ত প্রবল। অধীন গরীব। সুতরাং

স্বচক্ষে যাহারা এ-ব্যাপার দেখিয়াছে, তাহারাও জমিদারের ভয়ে সাক্ষী দিতে নারাজ। এইবার হুজুর মালিক।

এবং গণেশ নাকি ইহাও বলিয়া আসিয়াছে যে, সে তাহার মান, সম্ভ্রম, ইজ্জৎ, সম্পত্তি, আজ হইতে সবই ওই শ্রীপাদ-পদ্মে সমর্পণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সংবাদটি পত্রে-শাখায় পল্লবিত হইয়া নবীনের কানে পৌঁছিতে দেরি হইল না।

কাহার একটা দেওয়ানী মোকর্দ্দমার সাক্ষ্য দিতে ও-পাড়ার হারু লাএককে সেদিন আদালতে যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপারটা সে-ই প্রথমে নবীনকে বলে।

"—বেটা খালি আমার দিকে গর্জ্জে' গর্জ্জে' তাকায়, বুঝলে নবীন? আর-একটু হলেই হয়ে যায় আর-কি—

আদালতের উপরেই। নিজেই সাম্‌লে নিলাম শেষে,—বলি, কাজ-কি বেটা ছুঁচো বেহায়া ছোটলোকের সঙ্গে—”

বৈঠকখানাটি সীতাপতিবাবু নিজেই দখল করেন, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে নবীন বড়-একটা তাঁহার কাছ ঘেঁসে না, স্কুলের একটি ঘরে প্রায়ই সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সেদিনও সে বাহিরের উঁচু রকের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল।

হারু লাএক তাহার হাতে-ঝুলানো ফুলকফিটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, “হুঁঃ! সস্তা হয়েছে,—সস্তা হয়েছে না আরও-কিছু! এই ত' দেখ্‌ছ কতটুকুন্‌,—দশ পয়সার একটি আধলা কমে ছাড়লে না।”

আদালত-ফেরৎ তখনও সে বাড়ী ঢুকে নাই।

নবীন বলিল, “এখনও বাড়ী ঢোকেননি বুঝি? যান—আপনি বাড়ী যান।”

বলিয়া সে নিজেও উঠিল।

“কই আর গেলাম বাবাজি? এই এত বড় খবর—তোমাকে আগে না জানিয়ে কি আর······এই তুমিই

হয়ত বলতে যে হারু খুড়ো আদালতে গিয়েছিল সেদিন, অথচ খবরটি আমায় দেয়নি।—”

সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। সীতাপতিবাবুর বৈঠক-খানায় নাতি-ঠাকুরদা'র বৈঠক্ বসিয়াছিল। নিজে তিনি একটি চৌকির উপর আলোর সুমুখে বসিয়া কাহাকে একখানি চিঠি লিখিতেছিলেন, এবং তাঁহার দৌহিত্র ফটিক, চোখের সুমুখে একটি বর্ণপরিচয়ের বই খুলিয়া সুমুখে আলোর পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া ছিল।

লাল ও হলুদ রঙে চিত্র-বিচিত্রিত ছোট একটি ফড়িং উড়িয়া উড়িয়া ক্রমাগতই আলোর কাঁচে মাথা ঠুকিতেছে। ফটিকের ইচ্ছা, তাহাকে একবার সে হাতে করিয়া ধরে, এবং সেজন্য তাহার হাত দুইটি অনেকক্ষণ হইতেই নিশ্‌পিশ্‌ করিতেছিল।

বহুক্ষণ চেষ্টার পর সত্যই সে ধরা পড়িল। ফটিক তাহার বাঁ-হাতের সুন্দর কচি দুইটি আঙুলের ডগায়

অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে ফড়িংটিকে চাপিয়া ধরিয়াই আপনমনে বলিয়া উঠিল, "ধরেচি, এই দেখ দাছু,—ইরে বাবা রে!"

ফড়িংটি উড়িয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবুর চিঠি লেখা বন্ধ হইল না। হেঁট্‌মুখে লিখিতে লিখিতে কহিলেন, "ছেড়ে দাও। ছিঃ, ফড়িং ধরে না। ওদের লাগে।"

অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ফড়িংটিকে সে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। বলিল, "হ্যাঁ—ওদের লাগে, ওরা যেন মানুষ, ওরা যেন ভাত খায়!......বা রে! এর আবার দুটো চোখ আছে—।"

চোখ দুইটি দেখা তাহার শেষ হইলে, ফড়িং-সমেত হাতখানি ফটিক তাহার দাদুর মাথার কাছে অত্যন্ত সন্তর্পণে লইয়া গিয়া বলিল, "দেব ছেড়ে? দিব্যি পাকা-পাকা চুল খাবে।"

এই সময় সুমুখে হঠাৎ পায়ের শব্দ হইতেই ফটিক চাহিয়া দেখিল, তাহার মামা নবীন ঘরে ঢুকিতেছে। ভয়ে ফটিকের হাতের আঙুল দুইটি আপনা হইতেই আল্‌গা হইয়া গেল, পাকা চুল খাইবার লোভ সম্বরণ

করিয়া ফড়িংটি উড়িয়া পলাইল। ছেলের ক্ষোভের আর অবধি রহিল না; পড়িবার ছলে বর্ণপরিচয়ের পাতায় 'ফ'-এর নীচে ফড়িংএর ছবিখানি খুঁজিবার জন্য একাগ্র মনোনিবেশ সহকারে তাহাকে পুনরায় মাথা নীচু করিতে হইল।

নবীন ঘরে ঢুকিয়াই নিঃশব্দে একবার দেওয়ালের আলমারি, একবার টেবিল, একবার জানালার উপরের কাগজপত্রগুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। দোয়াত, কলম, কিম্বা কাগজ-পত্রের প্রয়োজন হইলে এমনি করিয়াই সে এই ঘরে আসিয়া ঢুকে, এবং এমনি নিঃশব্দেই নিজের কাজ সারিয়া চলিয়া যায়।

সীতাপতিবাবু তখনও ঘাড় হেঁট্ করিয়াই লিখিতেছিলেন। 'দাদু'র ফড়িংএর উৎপাত হঠাৎ এত সহজে বন্ধ হইল কেমন করিয়া, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, লিখিতে লিখিতে প্রশ্ন করিলেন, "কেমন? গেল ত' উড়ে?"

ফটিকের কাছ হইতে জবাব আসিল না। কথা কহিল নবীন।

বলিল, "আমাদের নামে নালিশ করেছে।"

সীতাপতিবাবু ফটিকের জবাব না দিবার অর্থ বুঝিলেন। মুখ তুলিয়া কহিলেন, "কেন? কে?"

নবীন টেবিলের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "গণেশ পাঁড়ে। আমরা নাকি লোকজন নিয়ে ওদের মেরে' এসেছি সব।"

"করুক্, কিচ্ছু হবে না।"

বলিয়াই তিনি আবার তাঁহার কাজে মন দিলেন।

নবীন বলিল, "আমাদেরও নালিশ করা উচিত,—চাপ্‌রাশীর হাত থেকে গরু ছিনেয়ে নিয়েছে বলে'।"

"উঁ -"

"আমরাও ওর নামে নালিশ করব।"

ঘাড় নাড়িয়া সীতাপতিবাবু কহিলেন, "উঁহুঁ, আমাদের আর ও-সব হাঙ্গামায় গিয়ে কাজ নেই।"

নবীন বলিল, "আপনি বুঝ্‌ছেন না, এম্‌নি করে' ওর আস্পর্দ্ধা বেড়ে' যাচ্ছে দিন-দিন।"

সীতাপতিবাবু হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন, হাতের কলমটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বাড়ুক্, তোর কি? তোর এত

মাথাব্যথা কিসের ?—নালিশ-মোকর্দ্দমা করা এমনি মুখের কথা কি-না ! একটি হতে হতে দশটি হবে,—খরচ কত !"

"খরচ ত' এসময় কিছু হবেই।"

সীতাপতিবাবুর রাগের মাত্রাটা যেন আরও একটু-খানি বাড়িয়া গেল।

"—এঁঃ! হবেই। অম্‌নি বলে' দিলেই হলো—হবেই ! পাজি, শূয়োর, গাধা কোথাকার ! পাই কোথেকে, আমি পাই কোথেকে টাকা ? দাদা এক পয়সা দেবে না—তা জানিস ?"

ফটিক অত্যন্ত ভয় পাইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

অতি কষ্টে রাগ সম্বরণ করিয়া নবীনও সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল—

"বেশ তবে তাই হোক্। ওর যা-খুশী তাই করুক্।"

বইএর তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া সীতাপতিবাবু কহিলেন, "উঁ, দেখে যা। লাটের আদায়

হচ্ছে মোট ন'শ টাকা—তাও জোর-জবরদস্তি; আর দাদা লিখেছেন, এই ছ্যাখ্—।"

এই বলিয়া চিঠির কয়েকটি লাইনের উপর আঙুল দিয়া তিনি পড়িলেন, "পত্তনিদারের বার-শ' টাকা লাট্ থেকে যে-কোন রকমে আদায় করা চাই। আদায় তোমরা করতে জান না, আর সেই জন্যেই বছর-বছর তিনটি শ' করে' টাকা আমায় লোকসান দিতে হয়।"

চিঠিখানি পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "এর চেয়ে আদায় আবার কেমন করে করতে পারে মানুষে? কোন্ প্রজা উচ্ছেদ করব? কাকে মার-ধোর্ করব গিয়ে?—যার যা খুশী তাই করুক্,—যে মরে মরুক্—।"

মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, নবীন চলিয়া গেছে।

মনোহর বাগ্দি সেদিন আবার তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া ধরিয়া আনিল।

স্ত্রী কিছুতেই আসিতে চায় না।

মনোহর বলে, "সেটি হচ্ছে না বাবা, বারে-বারে কেবলই ফাঁকি দিচ্ছ তুমি।"

এই বলিয়া সে পথের অন্ধকারে জমিদারের দালান-বাড়ীটার দিকে তাকাইয়া বলে, "বাবুদের ওই চিল্-কোঠায় তালা-চাবি মেরে' আট্‌কে রাখা হবে, দেখি, এবার কেমন করে' পালাও।"

গরবী তাহার শক্ত হাতখানা ছাড়াইবার চেষ্টা করে।

চুড়ি পরা নরম হাতখানা মুস্‌ড়াইয়া ফেলিতে মনোহরের বেশিক্ষণ সময় লাগে না, ধীরে-ধীরে একবার পিছনের দিকে ঘুরাইয়া দিতেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গরবী তাহার পিছনে-পিছনে চলিতে থাকে।

কিন্তু এত করিয়াও মনোহর তাহাকে তাহার ঘরে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না। বছর খানেক্ তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, মাঝে একটা ছেলে হইয়াও নাকি মরিয়া গেছে;—গরবী বলে, "তুই আবার কাউকে শাঙা কর্ উনোন্-মুখো, আমি তোর ঘরে থাক্‌ব না।"

এবং সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই সে পালায়।

স্কুলের একটি ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছিল। ভেজানো-দরজাটি ধীরে-ধীরে ঠেলিতেই মনোহর দেখিল, নবীন একটি চেয়ারের উপর জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে, টেবিলের একপাশে নামানো লণ্ঠনের পলিতাটা খাটো করিয়া দেওয়া হয় নাই,—কালি পড়িয়া কাঁচটা অন্ধকার হইয়া গেছে।

মনোহর বলিল, "এই যে হুজুর! বেটিকে আজ আবার ধরে' এনেছি। সেকি এখানে আজ্ঞে,—উ—ই সেই ভালুক-মারার পুল থেকে'—"

বৎসরের মধ্যে বহুবার এই মোকৰ্দ্দমাটি তাহার হাতে আসে।

মুখ ফিরাইয়া নবীন বলিল, "তবে আর ভাবনা কি আমার! 'কেতাত্ত' করে' দিলেন আর-কি!—যা, বাবার কাছে যা,—আমার কাছে কি জন্যে এসেছিস্ মর্‌তে?"

"উনিই যে পাঠিয়ে দিলেন বাবু।—ব'স্ হারামজাদী ব'স্ এইখানে!"

গরবীর হাতখানা সে আর-এক প্যাঁচ ঘুরাইয়া দিয়া চৌকাঠের বাহিরে তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দিল।

নবীন আর কোনও কথা বলিল না, সুমুখে দেওয়ালে-টাঙানো জ্যামিতির ত্রিভুজ-আঁকা ছেলেদের 'ব্লাক্-বোর্ড'-টার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মনোহর বলিল, "মাগীর শয়তানী বুদ্ধি দেখেছেন বাবু?—এই দেখুন—……তোমার পেটে এত বুদ্ধি বাবা!" বলিয়াই সে চট্ করিয়া একবার গরবীর মুখের পানে তাকাইয়া লইল।

নবীন তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইতেই মাটির একটা মালসা ঘরের মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া মনোহর বলিল, "কাপড়ের একটি বিঁড়ে পাকিয়ে এইটি ও চড়িয়ে নেয় মাথায় —এর ওপরে আগুন থাকে, আর ওর আঁচলে থাকে খানিকটে ধুনো। অন্ধকারে বেরাস্তা ধরে' পথ চলে, আর মাঝে-মাঝে একমুঠো করে' ধুনো ওই আগুনে ছিটিয়ে দেয়,—দপ্ করে' জ্বলে' ওঠে, আবার খানিক্ পরে নিবে যায়, আবার ছিটোয়, আবার জ্বলে, আবার নেবে,—লোকে ভাবে, শাঁকচিন্নি পেত্তা-টেত্তা হবে বুঝি। ভয়ে কেউ আর ও-পথ মাড়ায় না,—দিব্যি নিশ্চিন্তি ও আপনার সিধা চলে' যায়।—শুনুন, একবার ওর বিদ্যেটি শুনুন

হুজুর! তাই ত বলি,—এই গেল, এই গেল, ধর্, ধর্ ধর্—ছুট্‌লাম পিছু-পিছু, বাস্ আর নেই!"

নবীন বলিল, "ওকে ছেড়ে' দে—ওর যেখানে খুশী চলে যাক্।"

সেই সামান্য আলোকেই দেখা গেল গরবীর চোখদুটা আশায়, আনন্দে হঠাৎ একটুখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মনোহর বলিল, "ছেড়ে' দেব? বিয়ে-করা ইয়ে ছেড়ে' দেব কি আজ্ঞে? না আজ্ঞে, তা আমি—ওকে ত' আমি মাগ্‌না আনিনি—বিয়ে করে' এনেছি হুজুর!"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নবীন বলিল, "এনেও ত' পারিস্‌নি রাখ্‌তে,—ও থাক্‌বে না।"

"থাক্‌বে না কি হুজুর? আল্‌বাৎ থাকবে। বিয়ে করেছি—ওর বাপ্ থাক্‌বে।"

নবীন রাগিয়া উঠিল।

"তবে আবার আমার কাছে কি জন্যে এসেচিস হারামজাদা? তাই রাখ্‌গে যা,—যেমন করে' পারিস্ ধরে' রাখ্‌গে।"

ঘাড় নাড়িয়া মনোহর বলিল, "সেই হুকুমটি আমি

চাইছি হুজুর! ধরে' আমি ঠিক্ রাখ্‌বই। আচ্ছাটি করে' বেঁধে' আমি ওকে ঘরে পুরে' রাখ্‌ব সারাদিন,—দেখি কেমন করে' পালায়। আর—আচ্ছাটি করে' পা থেকে' মাথা পর্য্যন্ত······সেই হুকুমটিই আমি চাইছি হুজুর,—তখন বলবেন না যে, তুই কেন মেরেছিস হারামজাদা বল্!"

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু মনোহর বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, "এতেও যদি কোনদিন পালায় হুজুর, সন্ধান করে' আমি ঠিক্ খুঁজে বার করবই।—তারপর আমি দেখে' নেব—"

এই বলিয়া সে একটা বেফাঁস্ খারাপ কথা তাহার সেই বিবাহিতা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিল।

নবীন রাগিয়াই ছিল, এইবার তাহার আর সহ্য হইল না, মেঝে হইতে চটিটা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে মনোহরের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "যাচ্ছে-তাই আরম্ভ করেছে শূয়ার! বে-যবানী মুখখিস্তি দেখ,—মহতাপ্।"

ইস্কুলের অন্ধকার চালায় মহতাপ্‌ কোথায় না জানি বসিয়া ছিল, ডাক শুনিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"বাঁধ্‌! বেঁধে রাখ্‌ এদের ওই খুঁটিতে!—দশ টাকা জরিমানা দিক্‌,—দিয়ে উঠে' যাক্‌! হারামজাদা, পাজি, শূয়োর, ছোটলোক, চোয়াড়!—মুখখিস্তি করবার আর জায়গা পাওনি? কিছুতেই ছেড়ো না তুমি মহতাপ্‌!"

নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল। রাগে তাহার মুখ দিয়া তখন আর কথা বাহির হইতেছিল না।

দরজা দিয়া নবীন পার হইতে যাইবে, মনোহর পা-দুইটা তাহার জড়াইয়া ধরিল।

"—দোষ করলে ওই মাগী, আর দণ্ড হলো আমার! এ কখনই হুজুর······ও আমাকে লেজে-গোবরে করেছে আজ্ঞে······এই ছটি মাস······আমার কি আর যবান-বেযবান······মাথার ঠিক্‌······"

আরও কত-কি সে বলিতে যাইতেছিল, নবীন তাহার পা-দুইটা ছাড়াইয়া লইয়া স্কুলের উঠানে গিয়া নামিল। বলিল, "বেশ, তবে মাগীই দিক্‌! ও-সব ন্যাকামি শুন্‌তে চাই না আমি। নাংটামি করবি অন্য গাঁয়ে গিয়ে—এ

গাঁয়ে চল্‌বে না। জরিমানা করেছি যখন—টাকা চাই আমি, টাকা চাই! তুমি ছেড়ো না মহতাপ্, খবরদার বলছি, দশটাকার এক-পয়সা কমে ছেড়ো না।—নষ্টামি করবার আর জায়গা পাওনি শূয়ার?"

মনোহর তাহার স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "শুন্‌লি ত? এ-গাঁয়ে ও-সব চল্‌বে না বাছাধন—তোর সেই বাপের ঘরে চল্‌তে পারে।—আর যাবি কখনও? আর যাবি? পালাবি?"—বলিয়া সে দাঁত-কট্‌মট্‌ করিয়া গরবীর হাতখানা আর-একবার মুচ্‌ড়াইয়া দিল।

গরবীর মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। হেঁট্‌-মুখে সে জড়সড় হইয়া বসিয়াই রহিল। চোখ দিয়া তাহার টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইতেছিল, কিন্তু অন্ধকারে তাহা দেখা গেল না।

নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মারছিস্ কেন, ওকে মারছিস্ কেন হারামজাদা?"

"না মারলে টাকা বেরোয় আজ্ঞে? না মারলে মেয়ে জব্দ হয়?"

মনোহর তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া নবীনের স্মুখে হাত জোড় করিয়া বসিল।

নবীন বলিল, "টাকা কোথা পাবে, ও টাকা কোথা পাবে ?"

"পাবে। যদি না পায়—হুজুর—" বলিয়া মনোহর সেখান হইতে উঠিয়া নবীনের কাছে আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ভাগে-আবাদে চাষ-বাস্ করে' ধান-পানি ত' চারটি পেলাম হুজুর,—সেই কটি বিক্কি-সিক্কি করে' না হয় আমিই দিয়ে দিলাম ধরুন! কিন্তুক্, বলুক্ ও,—আমার ঘরে থাক্‌বে। ধম্মাবতারের সাক্ষাতে বলুক্ যে, খেটে' খুটে সে টাকা ও আমায় শুধ্‌বে!······আর সে-ই যে সেই হুকুমটি আমাকে দিন্, —ঠেঙ্গার চোটে বাঁদর নাচাতে পারি আজ্ঞে,—ও ত' কোন্ ছার! ও ত মেয়েমানুষ! কতটুকুই-বা ওর 'জিউ'!"

"যা খুশী তাই কর্‌গে—মর্ বাঁচ্, কিছু জানিনে আমি। জরিমানার টাকা আমার ফেলে দিয়ে তারপর উঠে যা।"

বলিতে বলিতে নবীন পিছন্ ফিরিয়া স্কুলের আর-একটা ঘরের চালায় গিয়া উঠিল।

মনোহর বলিল, "শুন্‌লি ত' ? হুজুর কি বল্‌লেন শুন্‌লি ত' গরব ?"

মহতাপ্ তখনও তাহাদের আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বাবু চলিয়া যাইতেই তাহার একটুখানি সাহস বাড়িল; রুক্ষ কর্কশ ভাষায় মনোহরকে জানাইয়া দিল যে, জরিমানার টাকা তাহার তৎক্ষণাৎ চাই-ই, এমনকি, এই শীতে যদি তাহাকে আর মিনিট-খানেক্ দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে তাহাকেও কিছু লাগিয়া যাইবে।

মনোহর তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "এই যে মহাদেব-সায়েব, সেই কথাই ত' বাবা······আচ্ছা তুমিই ওকে বেশ করে' বুঝিয়ে-সুজিয়ে বল না ভাই!"

স্কুলের একটা কুঠুরির ভিতর খিল বন্ধ করিয়া হেড-পণ্ডিত মহাশয়ের পাশাখেলা চলিতেছিল।

বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়া নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "ক'টা বাজ্‌লো পণ্ডিত-মশাই?"

নর্ম্ম্যাল-পাশ এই বাংলা পণ্ডিতটি বিদেশী মানুষ। মাসিক কুড়ি টাকা মাহিনা দিয়া তাঁহাকে এখানে আনিতে হইয়াছে। স্কুল ঘরেই রাত্রিবাস করেন, পেসন্ন-বুড়ীর ঘরে অভ্যাগত হিসাবে পয়সা দিয়া দিনে খাইয়া আসেন, রাত্রিটা দোকানের মুড়ি-মুড়কির উপরেই চলে।

নবীনের গলার আওয়াজ পাইবামাত্র পণ্ডিত মহাশয় দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিয়া দেওয়ালে-টাঙানো জাপানী-ক্লকটার ইংরেজি-অঙ্কের অক্ষরগুলা মনে-মনে গুনিতে আরম্ভ করিলেন।

হারু লাএক ইহারই মধ্যে ফুলকফিটি ঘরে রাখিয়া আসিয়া কখন যে পণ্ডিতের সঙ্গে পাশায় মাতিয়াছিল কে জানে!

পাশা খেলা ফেলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে উঠিয়া আসিল।

ঘড়ি দেখিয়াই নবীন চলিয়া যাইতেছিল, হারু লাএক তাহার পিছনে-পিছনে অন্ধকার উঠানের মধ্যে গিয়া বলিল,—"শোন বাবাজি,—একটা কথা আছে।"

"কি ?"—বলিয়া নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

লাএক বলিল, "ঠিক্! যা ভেবেছিলাম তাই।"

বলিয়াই সে একবার অন্ধকার উঠানের এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া দেখিতে গিয়া দূরে মনোহর-গরবীর উপর নজর পড়িতেই বলিয়া উঠিল, "ওরা কে ?"

পাশাখেলার ঝোঁকে এতক্ষণ কিছুই তাহারা টের পায় নাই।

নবীন বলিল, "কেউ নয়। বলুন—!"

লাএক একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া চুপিচুপি কহিল, "গণেশ তলে-তলে খবরটি ঠিক রেখেছে যে আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম। বাড়ী যাচ্ছি,—গণেশের দরজাটা কোনরকমে পেরোলাম। তারপর, যেমনি কামার-

শালের কাছাকাছি আসা, বুঝ্‌লে কিনা—অম্‌নি টের পেলাম, কে-একটা লোক অন্ধকারে সড়াচ্‌ করে' ঢুকে' পড়লো—পাঁড়েদের সেই বেলগাছ-ওয়ালা পড়ো-বাড়ীটায়। লোকটার হাতে একটা লাঠি ছিল। বুঝ্‌লে কিনা? ডাকলাম—কে! কে! বাস্‌! সব চুপচাপ্‌! আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। ভয় হলো। অন্ধকারে ওই অশথ্‌-গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি,—ঠিক! ওরাই দু' বাপ্‌-বেটা। অনুমানে বোধ হলো যেন আমার কথাই হচ্ছে। ভাবলাম, বলি, যাই—আমাদের বাবাজিকে একবার বলি গিয়ে। বুঝতাচ্ছ? রোজই ত' আমাকে অন্ধকারেই যাওয়া-আসা করতে হয়,—তাই ভাবছি,—বেটারা যদি আমাকেই শেষকালে—"

এতগুলা কথা একটানে বলিতে গিয়া লাএক যেন হাঁপাইয়া পড়িল।

নবীন বলিল, "কি করতে হবে আমায়? আমি নিজে দাঁড়িয়ে দিয়ে আস্‌ব?"

কথাটার অর্থ লাএক ঠিক বুঝিতে পারিল না, বলিল, "উঁহুঁ, হট্‌ করে' অমন সাহসটি কোনদিন করো না

বাবাজি! রাগটা যেন তোমার আর আমার উপরেই একটুখানি বেশি বলেই মনে হয়।"

এই বলিয়া হারু লাএক অন্ধকারে আর-একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল, তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি একটুখানি সাবধানে থেকো বাবাজি,......আমায় দাঁড়িয়ে দিয়ে আসবার কথা বলছিলে, কিন্তু এত' আর এক-আধদিনের মামলা নয় বাবাজি—বারমাস ত্রিশটি দিন যে আমায় এখানে আস্‌তে হয় বাপ্‌। দিনান্তে তোমাদের খবরটি একবার করে' না নিলে কেমন যেন কিছুই আমার ভাল লাগে না।—তোমার একটা লোক-জন—সেই যে মহাদূত না কে,—সেই তাকেই যদি একবার......বুঝ্‌তাল্লে ?"

বুঝিতে নবীন সবই পারিতেছিল। ভয় সে অন্ধকারে চিরকালই পায়।

নবীন কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া লাএক আবার বলিয়া উঠিল, "রোজ এই রাত ন'টার সময়—এইখানেই,—এই আমাদের পণ্ডিত-মহাশয়ের ঘরে ......জ্যোৎস্না রাত হলে আর ঘর পর্য্যন্ত যেতে হবে না,

অশথ্-তলা পর্য্যন্ত গেলেই—বুঝ্লে কিনা বাবাজি,—বলে' দিও তাহ'লে মহাদূতকে।"

নবীন বলিল, "তার চেয়ে অন্ধকারে আপনি বেরোবেন না লাএক-মশাই, আপনাকে রোজ দাঁড়িয়ে দেবার মত লোকজন এখনও আমার এত সস্তা হয়নি—বুঝ্লেন?"

হারু লাএক একেবারে যেন আকাশ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। আম্তা আম্তা করিয়া বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ, তাও ত' ঠিক্, সেকথাও সত্যি,—কাজ কি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে,—হ্যাঁ, দরকারই-বা কি……না কি বল বাবাজি—?"

কিন্তু বাবাজি তখন অনেক দূরে।

অতি তুচ্ছ সংসারের একটি ঘটনা লইয়া ঝগড়া বাধে—এমন প্রায় রোজই।

বৌ বলে, "ভাতে হাত বাড়াবার সময় গু'য়ে হাত বাড়িও। কানা হও, কানা হও, দুটি চক্ষের মাথা খাও।"

ঠাকুরঝি বলে, "আ—। তাও যদি না কিল্-দুমা-দুম্! কেন, তুমি কানা হও না বৌ? আমরা ভাইএর বিয়ে দিই।"

নবীনের বৌ বলিল, "তোমাকে ত বলিনি ঠাকুরঝি, —যাকে বল্‌চি তাকে বলচি।"

বড় মেয়েটা কাছে ছিল না, কোলেরটার বয়স—বছর আড়াই। তাহারই একটা হাতের নোলা ধরিয়া টানিতে টানিতে রান্না ঘরের দিকে এই বলিয়া সে চলিয়া গেল যে, মেয়ের ছেলেই 'সগ্‌গো' দেবে, আর ছেলের মেয়ে যেন কুড়িয়ে-পাওয়া। তাই আমার মেয়ের দুধ—রোজ-রোজ বেরালে খায়। চোখের মাথা খেয়ে কানা হয়েছেন সব, —কেউ আর দেখতে পায় না।......

কিন্তু শাশুড়ীর কানে টনক্ বাজিল।

নূতন রাঁধুনীটি কোন কাজের নয়। যাহাকে কম করিয়া দেওয়া উচিত, তাহাকেও বেশি দিয়া ফেলে,—মাত্রাজ্ঞান তাহার মোটেই নাই। তাহাকেই কয়েক্‌টা সৎপরামর্শ দিবার জন্য তিনি রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিলেন। বৌএর কথাটা কানে যাইবামাত্র চট্ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

বৌ তাঁহার ঠিক্ সামনেই পড়িয়া গেল। মুখে আর তিনি কোনও কথা বলিলেন না, তৎক্ষণাৎ বাঁহাতের দুইটি আঙুল দিয়া বৌএর হাড়-ওঠা গালের চামড়াটা টানিয়া ধরিলেন, এবং অতি সত্বর সুমুখের আখা-শালে তাহাকে টানিয়া আনিয়া জ্বলন্ত একটা চ্যালা কাঠ আখা হইতে বৌএর মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "দেব ধ্বেসে'? দেব চোখ দুটো কানা করে' সব্বনাশীর? তোর বাবা কানা হোক্, তোর ভাই কানা হোক্, তোর সাতগুষ্টি কানা হোক্—চোখের মাথা খাক্, আমরা কানা হতে যাব কিসের লেগে' হারামজাদী?"

জ্বলন্ত ওই পোড়া কাঠটা তাহার চোখে আসিয়া লাগা কিছুই বিচিত্র নয় ভাবিয়া বৌ তাড়াতাড়ি তাহার গাল হইতে শ্বাশুড়ীর হাতখানি টানিয়া ছাড়াইয়া দিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল।

শ্বাশুড়ীও বোধকরি একটুখানি ভয় পাইয়াই হাতের কাঠটা বৌএর গায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

বৌ একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল, কাঠটা তাহার গায়ে লাগিল না। কিন্তু নখের ঘায়ে গালে তখন তাহার রক্ত

ঝরিতেছিল। তাহারই যন্ত্রণার চোটে বোধ করি বৌ আর চুপ করিয়া রহিল না, সুমুখে কাঁসার একটা বড় ঘটি পড়িয়াছিল, তাহাই সে তাহার শাশুড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

ঘটিটা তাঁহার হাঁটুর এমন জায়গায় গিয়া লাগিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন,—ছুটিয়া গিয়া যে সর্ব্বনাশী বৌকে ঘা-কতক্ বসাইয়া দিয়া আসিবেন তাহারও আর অবসর মিলিল না।

নবীন খাইতে আসিয়া দেখে, মা তাহার রান্নাঘরে রাঁধুনীর কাছে বসিয়া গল্প করিতেছে। দিদি তাহার খাবার ধরিয়া দিল।

দিদি বলিল, "বৌ ত' আজ আর-একটু হলেই মাকে দিয়েছিল খুন করে'।"

প্রতিদিনের মত নবীন গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া খাইতে লাগিল,—কোন জবাব দিল না।

দিদি আর একবার রুটি দিতে আসিয়া কি-একটা

কথা যেন তাহাকে বলিতে গেল, কিন্তু নবীনের ভাব-গতিক্ দেখিয়া সেবার আর তাহা বলা হইল না।

তৎক্ষণাৎ আরও খান্-কতক্ রুটি লইয়া আসিয়া কথাটা বলিবার জন্য সে উস্খুস্ করিতে লাগিল। এবং পুনরায় তাহার থালার উপর রুটি দিতে গিয়া তাহা বলিয়াও ফেলিল—

"গয়লা-বৌএর ঘর থেকে দুধ আমি আধ সের কিনে আনালাম। বৌ বলে, আমার ছবি লবির ভাগ কেটে নিয়েচিস্। ফটিককে বলে কিনা সে মরে' যাক্, তা নইলে মেয়েরা আমার—......উঠ্‌লি যে এরই-মধ্যে? হয়ে গেল খাওয়া?"

বোবার মত চুপ করিয়া নবীন আঁচাইবার জন্য উঠিয়া গেল।

দূর হইতে মা বলিল, "ওরও যে মতিচ্ছন্ন ধরেছে দেখ্‌ছি।"

দিদি তাহার পরিত্যক্ত থালাটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "একটি রুটি খেয়েছে মোটে—। ফটিক ঘুমোলো নাকি?"

অন্ধকার গভীর রাত্রে নবীনের ছোট মেয়েটা কাঁদিয়া উঠিল।

নবীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বলিল, "কাঁদিও না বল্‌ছি, চুপ করাও, নইলে খুন করে' ফেল্‌ব।"

"কাঁদছে ত' আমি কি করব? কাঁদিস্‌নে হতভাগী, কাঁদিস্ নে।" বলিয়া বৌ তাহার পিঠের উপর ভিট্ করিয়া এক চড় মারিয়া তাহাকে আরও কাঁদাইয়া দিল।

নবীন উঠিল। সুমুখের দরজাটা খুলিয়া সিঁড়ি দিয়া সে ছাতে চলিয়া গেল।

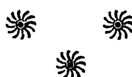
প্রভাত হইতে আর বেশি বিলম্ব নাই। অত্যন্ত শীত করিতেছিল। দূরে ষ্টেশনের আলো জ্বলিতেছে।

নবীন অত্যন্ত ত্রস্তপদে খোলা ছাতের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। মাথার ভিতর কিসের যেন একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ হইতেছিল।

গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। গাঁয়ের পাশে, রাঙামাটির পাকা রাস্তার উপর দিয়া, ব্যাপারীদের বোঝাই-গাড়ীগুলা বোধকরি শহরে চলিয়াছে।

চিল্‌-কোঠার পাশে নবীন তাহার আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া বসিল। গাঁয়ের কয়েকটি খড়ো-ঘরের চাল ছাড়া আব্‌ছা-অন্ধকারে দূরের আর-কিছুই তাহার নজরে পড়িল না।





নবীনের কাছে রাখহরি-হরেকিষ্টর আসা-যাওয়া আজকাল একটুখানি ঘন-ঘনই হইয়া উঠিয়াছে।

রাখহরির মাথার ঘা শুকাইয়াছে, কিন্তু কাঁচা রক্তের দাগ-লাগানো সাদা কাপড়ের ফেটিটি সে এখনও মাথা হইতে নামায় নাই।

সেদিনও সে নবীনের কাছ হইতে উঠিয়া যাইবার সময় মাথার কাপড়টা বেশ ভাল করিয়া বসাইয়া লইয়া বলিল, "নালিশ-মোকদ্দমা আমাদের যা-কিছু করা—সবই ওই তোমার ভরসায় ভায়া! ধরে-বেঁধে আদালতে সেদিন তুমি আমায় পাঠালে তাই,—তা-নইলে আমাদের আর কী এমন সাধ্যি আছে···যে-রকম দেখ্‌ছি, তাতে ত' বেশ সুবিধে হবে বলে'......আর গোটাকতক্ সাক্ষী, গোটা-চারের কম নয়,—বেশ চোখালো-গোছের। তাও পারি; কিন্তু টাকা-পয়সার এমনি টানাটানি······

বলেইছি ত' ভায়া······আমাদের আর এমন কী সাধ্যি আছে...”

হরেকিষ্ট হাতজোড় করিয়া বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, টাকা কিছু খরচ না করতে পারলে বেটার হেস্ত-নেস্ত কিছু······কিন্তু হোক্ আর না-ই হোক্, এই আমি বলে রাখ্ছি হুজুর, বেটাকে ফাঁকে যদি কোনদিন পাই ত' ওর মাথাটি আমি এই দাঁত দিয়ে চিবিয়ে—”

গ্রামের পুরোহিত-পুত্র চণ্ডী ভট্চাজকে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া দাঁত তাহার বাহির হইয়াই রহিল।

নবীন বলিল, “এসো, তোমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম।”

“আসি আমরা।” বলিয়া হরেকিষ্ট ও রাখহরি উঠিয়া গেল।

জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের অধিকাংশ যজ্মান এই চণ্ডী ভট্চাজের। পিতা তাহার সম্প্রতি মারা গিয়াছেন, কাজেই চণ্ডীকেই এখন সব করিতে হয়। বাপের মস্ত ভুঁড়ি ছিল, চণ্ডী ভাবে, তাহারও বুঝি ভুঁড়ি হইতেছে, এবং সেইজন্য ঠিক সে তাহার বাপের মত

খাটো গামছা পরিয়া হর্‌দম্‌ ঘুরিয়া বেড়ায়; লোকের সঙ্গে কথা বলিবার সময় তিনি খুব খানিকটা হড়্‌হড়্‌ করিয়া যা'-তা' বকিয়া যাইতেন,—চণ্ডীও ঠিক তেমনি-ভাবে কথা কহিবার চেষ্টা করে। মাথায় এক মাথা চুল, বেঁটে-গোছের কালো চেহারা, গায়ে একটা পাঁশুটে রঙের সুতির কাপড় জড়ানো, ধুতির পরিবর্ত্তে নীচে সেই খাটো-গামছা। শীত একটুখানি বেশি পড়ায় দিন-কতক্‌ সে তাহার ছোট ভাইএর জুতা ও লাল-রঙের ছেঁড়া মোজা দুইটা পরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সম্প্রতি পায়ে ফোস্কা পড়ায় সেগুলা সে পরিত্যাগ করিয়াছে। দাঁত সে কখনও মাজে না, তাহার উপর চব্বিশ ঘণ্টা পান-দোক্তা চিবাইয়া দাঁতের উপর চমৎকার কালো ছাপ পড়িয়াছে। মুখের কাছে মুখ লইয়া কথা কহিতে আসিলে সে-সম্বন্ধে কেহ যদি কোনও মন্তব্য প্রকাশ করে,—চণ্ডী তৎক্ষণাৎ তাহাকে জবাব দেয়, "শাস্ত্রে আমাদের চত্তারিংশৎ প্রকার দন্তধাবন প্রণালী আছে, তার মধ্যে সকালে উঠে পূব-মুখো দাঁড়িয়ে পনেরবার কুল্‌কুচু করা—একটা। আমি তাই করি। আমার দন্ত-হারিশ আছে।...তোমার ও গরু

জোড়াটার দাম কত হে?" এম্‌নি-সব অবাস্তর প্রশ্ন করিয়া কথাটাকে সে চট্ করিয়া পাল্টাইয়া দেয়।

মাঝে মাঝে তাহার গাল ফোলে, মাড়ি ফুলিয়া দাঁতের গোড়ায় বেদনা হয়, এবং সেই অস্বস্তিকর যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাস-খানেক আগে সে কোন্ এক কাব্‌লি-ওয়ালার কাছ হইতে আগামী বৎসর পয়সা দিবে বলিয়া একটি বাঁদর-টুপি কিনিয়াছে। সেদিন সে সেটি পরিয়াই আসিয়াছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা আবার কিজন্যে কিন্‌লে ভট্চাজ?"

সেকথার কোনও জবাব না দিয়াই চণ্ডী ভট্চাজ্ কহিল, "চশমা একটি কত্‌দিন থেকে চাইছি—তুমি খুব দিলে যা-হোক্! ইষ্টিশানে সেদিন হার্‌মনির দোকানে দেখে' এলাম, তেম্‌নিই একটা দাও নাহয় কিনে! বাবারটা খুঁজে পাচ্ছিনা,—তবে আর চাইছি কেন হে?"

"বেশ কর্‌ছ। কিন্তু শোনো, গণেশ পাঁড়ের যজমান ঘরটি তোমায় ছাড়তে হবে ভট্চাজ।"

জবাবের অপেক্ষায় নবীন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

"ও ত একরকম ছেড়েই দেওয়া ধর। ন'মাস-ছ'মাস বাদে এক-আধটা কাজকম্ম,—পাওনা ত' ভারি! ভারি ত' পাওনা! হ্যা"—

কিন্তু কথা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গে চণ্ডী ভট্চাজের মুখ-খানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। বলিল,

"তবে যদি আক্রমণ-টাক্রমণ করে কোনদিন? যদি আমায় ধরে' মারে? ও-বেটাকে ত' বিশ্বেস নেই—"

নবীন বলিল, "খাবে—মার খাবে। তা আমি কি করতে পারি? আমি কি করব তার?"

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া ভট্চাজের শুক্নো টুপিপরা মুখখানির দিকে তাকাইয়া সে আবার কহিল, "আর নাহয় আমাদের ঘরটাই ছেড়ে দাও, মার খাওয়ার ভয়-ভাবনা আর থাক্‌বে না।"

কথাটা বোধকরি ভট্চাজের মনঃপূত হইল না; প্রত্যুত্তরে ঈষৎ হাসিল মাত্র। অনুমানে বোধ হইল তাহার মনোভাব এই যে, জমিদার-যজমানের ঘরে মার

খাইবার ভয়-ভাবনা থাকে ত থাকুক্! যে গরু দুধ দেয়, সে যদি পা ছোঁড়ে ত ছুড়ুক্‌.....

হাসিটা নবীনের ভাল লাগিল না। বয়সে তাহার চেয়ে সে বেশি বড় নয়,—মাঝে-মাঝে ইয়ারকি ফষ্টি-নষ্টি করে; কিন্তু এ সময় সে-সব ভাল লাগে না।

কাজেই কথার গুরুত্বটা নবীন তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য জোরে একটা ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিল, "ইয়ার্‌কি-তামাসা পেয়ে গেছ না কী? হাস্‌ছ যে? হাস্‌ছ যে?

চণ্ডী ভট্‌চাজের মুখের হাসিটি কালো মেঘে একবার মাত্র বিদ্যুতের মত চমক্ হানিয়া, গোঁফ্-দাড়ির জঙ্গলে সহসা মিলাইয়া গেল। শীতের সকালেও, কপালে তাহার বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিল। মুখখানা সে দেখিতে দেখিতে কাঁদুনে'-ছেলের মত তৎক্ষণাৎ কেমন করিয়া যে গম্ভীর করিয়া ফেলিল, সে এক দেখিবার মত বস্তু। বলিল,

"হাস্‌ব কেন নবীন,—হাসিনি। মরে মরে—চোর যে, সে দশ-ঘর ডুবিয়েই মরে। ধীরেন-কাকা যে কাণ্ডটি

করে' রেখে গেল—বেঁচে থাক্‌লে আমি তার মাথার ওপর গুণে' গুণে' দশটি জুতো বসিয়ে দিতাম।"

সেকথা সত্য। ধীরেন ভট্‌চাজ্‌ তাহারই জ্ঞাতি-সম্পর্কে কাকা ছিল। সম্প্রতি সে সিউড়ীতে হোটেল করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছে। কিন্তু যে কাণ্ডটি সে করিয়া গেছে, তাহা স্মরণ-যোগ্য, এবং সে জন্য চণ্ডী ভট্‌চাজের রাগ হইবারই কথা।

ধীরেন ছিল শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। টাকা দিয়া ছেলেকে বিবাহ করিতে হয়, অভিভাবকও কেহ ছিল না, কাজেই একটি বউ আনিয়া ঘরকন্না করিবার সাধ আর বেচারির মিটিল না, এবং ইহার জন্য তাহার মনস্তাপেরও আর অবধি ছিল না। ঝড়ো-কাকের মত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত—গ্রামে সে প্রায়ই বাস করিত না। কখনও শোনা যাইত, কাছেই কোন্‌ কয়লা-কুঠিতে সে রীতিমত কেরাণীর কাজ করিতেছে, আবার কখনও খবর আসিত, কুল্‌টির বাজারে একটা ময়রার দোকানে সে সন্দেশ বেচিতেছে। আবার হয়ত একদিন দেখিতে-না-দেখিতে গ্রামে আসিয়া হাজির!—গায়ে গরম জামা,

দামী আলোয়ান, পায়ে বুট-জুতা, মাথায় একটা শাল-সিল্কের রঙিন রুমাল বাঁধা। কিন্তু কথা নাই বার্ত্তা নাই গ্রামে ঢুকিয়াই সে একেবারে বসিত গিয়া ভৈরব-স্যাক্‌রার জুয়ার আড্ডায়। তেপাতি তাসের জুয়া খেলা চলে, প্রথম প্রথম দু'চার টাকা পায়, মদ খায়, ফুর্ত্তি চলে,—আবার দিন-কতক্ পরে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ফতুর হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসে, জুতা যায়, আলোয়ান বন্ধক পড়ে, গায়ের জামাটাও খুলিতে হয়,—পরনের মিহি ধুতিখানিও তখন ময়লা হইয়া যায়। তাহাই পরিয়া, কমদামি গাঁয়ের তাঁতি-ঘরের একটা মোটা কাপড় গায়ে জড়াইয়া আবার কোন্ দিন সকলের অসাক্ষাতেই গ্রাম হইতে উধাও হয়।

কিন্তু এই মরিবার কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রাম ছাড়িয়া সে আর কিছুতেই যেন যাইতে চাহিল না। কিছু জমি জমা ছিল,—দেবোত্তর জমি, এবং কুলদেবতা কৃষ্ণ-রাধিকার নিত্য-সেবার কিছু অংশ। ধীরেনের অবর্ত্ত-মানে ভ্রাতুষ্পুত্র চণ্ডীই তাহার সেবা চালাইত, জমির ধান-চাল গুলিও সে ভোগ করিতেছিল।

ধীরেন বলিল, "বর্দ্ধমানে হোটেল খুলব মনে করেছি।

জমি তুই আমাকে ছেড়ে দে চণ্ডী, বিক্রি করে' দেব।"

চণ্ডী ছাড়িতে চাহিল না। বলিল, "মাইরি আর কি! জমিতে সার-গোবর দিলাম, খরচ-খরচা করলাম, ঠাকুর সেবা চালালাম এত্‌দিন,—উপকার করলাম কিনা,—জমি এবার তুমি বিক্রি করবে বই-কি! করতে হয়—আমাকেই কর। দিচ্ছি গোটা পঁচিশ-ত্রিশেক—নিয়ে যাও।"

কিন্তু পঁচিশ-ত্রিশের কাজ নয়। হোটেল খুলিতে টাকার দরকার। ধীরেন বলিল, "তা আবার দেব না বাপধন? গুণের ভাই-পো কত তুমি! তোমার বাবাও ত' আমার খুব করে' গেছেন—একটা বিয়ে পর্য্যন্ত দিয়ে যেতে পারেন নি।"

চণ্ডী বাঁকিয়া বসিল। বলিল, "তাই বলে' আমাদের সাত পুরুষের ঠাকুর-সেবাটি ত' তোমার দায়ে আমি উঠিয়ে দিতে পারি না কাকা—পার ত' আদায় করে' নিও,—জমি আমি ছাড়্‌ব না।"

কিন্তু আদায় সে যে-কোনরকমে হোক্ করিয়া লইল।

নগদ একটি শ' টাকা হাতে হাতে পাইবামাত্র মায় ঠাকুরসেবা সমেত সমস্ত জমিটি সে গণেশ পাঁড়েকে লিখিয়া দিয়া গ্রাম হইতে সরিয়া পড়িল।

জমি দখল করিবার সময় গণেশকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না, জোর-জবরদস্তির কথা দূরে থাক্, চণ্ডী ভট্‌চাজের তরফ্ হইতে একটি কথাও কেহ বলিতে আসিল না।

তখন হইতে পাঁচটি দিনের ঠাকুরসেবা গণেশকেই চালাইতে হয়।

চৈতন বলে, "কেষ্ট-ঠাকুরটা নাহয় কালো-পাথরের, কিন্তু রাধিকাটা ডাঁহা পিতলের তৈরী,—ভারি ত' দশ-বার সেরের এক ছটাক কম নয়। উ-ই অতদূর থেকে দু' হাতে দুটো ঠাকুর বয়ে আন্‌তে আমি পারব না বাবা! তুমিও চল,—হাতাহাতি আলা-পালি করে' তুমিও খানিকটা আনবে, আমিও খানিকটা আনব।"

গণেশ বলে, "আমি আন্‌ব কি রে বেটা? রাস্তায় রাস্তায় আমি ঠাকুর বয়ে আন্‌ব কি? তার চেয়ে বরং এক কাজ কর্‌—ওই রাধিকাটাকে বাদ দিয়েই আনিস্।

কেষ্টকে আন্‌লেই চল্‌বে—বাস্! কেউ শুধোয়?—পট্ করে' বলে' দিবি—ও-সব মেয়ে-ঠাকুরের পূজো আমরা করি না, আমরা জাত-কন্নুজ্যে। বুঝলি? বেটা বুঝলি ত?"

সেইদিন হইতে ভারি রাধিকাটাকে ফেলিয়া হাল্‌কা কেষ্টটিকেই চৈতন পূজা করিবার জন্য তাহাদের ঘরে লইয়া যায়।

পাঁচদিনের পরের দিন চৈতন বলে, "এইবার আমি মাঠে যাই, না ঠাকুর রাখতে যাই—কোন্ কাজটি করি বল ত?"

গণেশ বলে, "ঠাকুর আবার রাখতে যাবি কিরে বেটা? যার গরজ সে নিজে এসে আমার ঘর থেকে নিয়ে যাবে। ও কোন্—খায় না পরে? থাক্ ওই ঘরের এককোণে পড়ে' থাক্ বেটা কেষ্ট! আর নাহয় দিবি ত' দে ওই কুলুঙ্গিতে তুলেই দে নাহয়,—অন্ধকারে ভঁ্যাট্‌রা-টঁ্যাট্‌রা আবার হোঁচট্ খেয়ে হাত-পা ভাঙ্গায় কেন?"

তাহাই হয়। ছয়-দিনের দিন দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে

কেষ্ট-ঠাকুরটি তোলা থাকেন,—চণ্ডী ভট্‌চাজ্‌ নিজে আসিয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া যায়।

ভট্‌চাজ্‌ সেদিন নবীনের কাছে ইহারই আপত্তি তুলিল।—ঘরের ভিতর হাতের কাছে পাইয়া যদি সে তাহাকে মারে...চোর বলিয়া যদি সে তাহাকে চালান্‌ দেয়...

নবীন বলিল, "পূজো ত তোমাকে বারমাসই করতে হয়, না তা হয় না?"

ভট্‌চাজ্‌ বলিল, "হ্যাঁ তা হয় বই-কি! বাবা ত' সেই কথাই বলতেন, পূজো ছাড়িস না বাবা, পূজো করি বলেই লোকে আমাদেরও পায়ে জল দেয়। পূজো কি আর ছাড়বার জো আছে হে?"

"তবে আর-কি! ঠাকুর ত' তোমার ঘরে দুবেলা দুসের চালের ভাত ওড়ায় না ভট্‌চাজ্‌,—তবে আর তোমার আপত্তিটা কি? ঠাকুর ওখানে না-ই বা

পাঠালে? ও পাঁচটা দিনও না হয় তুমিই চালিয়ে দাও।”

জবাবের অপেক্ষায় নবীন তাহার মুখের পানে তাকাইল।

“ও-সব অনেক ভজোকট হে! বুঝছ না,—ভাই-ভায়াদীর কাণ্ড-কারখানা······অংশীদার······মাকে বলব এখনি গিয়ে, বাস্‌, তেরিয়া-মেরিয়া করে’ উঠবে। সকালে উঠেই ডুব পাড়তে হবে, চা-ফা খেতে পাবে না—ও-সব অনেক হাঙ্গামা! আচ্ছা দেখি, তোমার বাবাকে একবার শুদিয়ে দেখি—”

নবীন এইবার রুখিয়া উঠিল।

“আচ্ছা যাও, তবে তাই বাবার কাছেই যাও। যাও এখনি যাও! তারপর আমি দেখে নেব—কাজেকর্ম্মে কে তোমাদের ডাকে! বাবাই ডাকুন, আর যে-ই ডাকুন... যাও!”

সুযোগ পাইলে এই ভট্‌চাজটিকে কেহই ছাড়ে না। মহতাপ শিব-দেউলের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাড়া-

তাড়ি ভট্‌চাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "যান্ ভটাচারি-মহাশয়, যান্ বাড়ী যান্।"

হাতটা তাহার ছাড়াইয়া লইয়া চণ্ডী ভট্‌চাজ বলিল, "দাঁড়াও হে, কাপড়টা পরতেই দাও না!"

"ঘরে—ঘরে পরবেন—যান্—"

মহতাপ তাহাকে একটুখানি ঠেলিয়া রাস্তায় নামাইয়া দিল।

ভট্‌চাজ্ মুখ তুলিয়া তাহার কোটরগত চক্ষু দুইটি একটুখানি চাড়া দিয়া কহিল, "মারবে নাকি? মারবে নাকি তুমি?"

বলিতে বলিতে ভট্‌চাজ্ একটুখানি দ্রুত পদেই সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

নবীন ডাকিল, "মহতাপ্!"

"হুজুর—"

"টাকা কই? টাকা? কাল্‌কের সেই জরিমানার টাকা?"

"নো রুপিয়া হুজুর।" বলিয়া মহতাপ তাহার কাপড়ের ট্যাঁক্ হইতে টাকা বাহির করিতে লাগিল।

"আর-এক টাকা কি হলো? নিজে মেরেছ বুঝি?"

মহতাপ তাহার সম্মতি জানাইয়া ঈষৎ হাসিল।

নবীন বলিল, "যাও, এক্ষুনি যাও, যাও জল্‌দি যাও, ওই ন' টাকা দিয়ে এসো যাও রাখহরিকে!"

জমির চাষ-আবাদের জন্য মুনিষ-কৃষাণ গণেশ পাঁড়ের ফি-বছর একটা করিয়া নূতন করিতে হয়।

বর্ষায় জমি নিড়ান্ হইতে আরম্ভ করিয়া ধানের গুছিতে যতদিন পর্য্যন্ত না পাকের রঙ ধরে, ততদিন মাঠের যাবতীয় কাজ তাহাকে দিয়াই সে করাইয়া লয়, তাহারপর, ফসলের ভাগ দিবার আগেই, যৎসামান্য একটা ছল খুঁজিয়া মার্-ধোর্ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়,—পাকা ধান নিজেরাই কাটিয়া ঘরে ঢুকায়।

সে-বছর নেপাল মুচির কপালে এই দুর্ভোগের যন্ত্রণাটি লেখা ছিল। বেচারা অত্যন্ত দুর্ব্বল—বড় ভাল মানুষ। সারা-বছরটা একপ্রকার সে ঘরের খাইয়াই খাটিয়াছে।

বছরের শেষে এই ধান কাটিবার সময়টায় গণেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

মার খাইয়া মনের দুঃখে সে নিজের ঘরে গিয়াই বসিয়াছিল। রাখহরির কাছে খবর পাইয়া, মহতাপ্ সেদিন দক্ষিণ-পাড়ার একপ্রান্তে, বাসক-বোয়ানের জঙ্গলে-ঘেরা মুচিপাড়ার ছোট বস্তিটি হইতে তাহাকে সে ডাকিয়া আনিল।

নবীন বলিল,

"মার খেয়ে যে ঘরে বসেছিলি হারামজাদা? কেন, থানা নেই? আদালত নেই?"

কাঁকর-মাটির দেওয়ালের উপর ঘসিয়া দিয়া গণেশ তাহার পিঠের খানিকটা চামড়া একেবারে তুলিয়া দিয়াছে। যন্ত্রণায় বেচারা অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, অতিকষ্টে পিঠের মেরুদণ্ডটা সোজা করিয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। হাতজোড় করিয়া বলিল, "গরীব লোক হুজুর, খেতে পাই না, সম্বচ্ছর খাটলাম চারটি খাব বলে'—"

বলিতে বলিতেই সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নবীন বলিল, "যাস্ কেন বাপু? জেনে-শুনেও ত' যেতে ছাড়বি নে। কাঁদিস নে, কাঁদিস নে,—চুপ কর্।"

স্ত্রী তাহার এই নিতান্ত দুর্ব্বল রোগগ্রস্ত স্বামীটিকে পথের মাঝে একা ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। ছোট ছেলেটাকে কোলে লইয়া মুচি-বৌ তখন অদূরে কবিরাজ মহাশয়ের ভাঙা-ভিটের পাশে, ন্যাড়া খেজুর গাছটার তলায় দাঁড়াইয়াছিল! নবীনের কথাটা শুনিবামাত্র কি যেন সে বলিতে গেল, কিন্তু নেপালের মুখখানির দিকে একবার তাহার দৃষ্টি পড়িতেই, তাহারও ঠোঁট দুইটা অভিমানী-মেয়ের মত একবার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল মাত্র, কথা তাহার আর বলা হইল না।

নবীন বলিল, "মহতাপ্! ডাক রাখহরিকে! দিয়ে এসেছ টাকা? ফিরে' নিয়ে এসো।"

বলিয়াই সে একবার নেপালের দিকে, একবার তাহার যুবতী-স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাক্ষী-প্রমাণ আছে? দেখেছে কেউ?"

কিন্তু সেই কঙ্কালসার নেপাল তখন তাহার সর্ব্বদেহের অসহ্য যন্ত্রণায় ঘন-ঘন পিঠ্-মোড়া খাইতেছিল,

বার-কতক উঁ-আঁ করিল মাত্র, কথাটার জবাব দিতে পারিল না।

জবাব দিল মুচি-বৌ। কোলের ছেলেটাকে নামাইয়া সে তখন স্বামীর কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল,

"খামারের ভেতর ঢুকিয়ে মেরেছেন বাবু। ও দস্যি কি কম বজ্জাত!"

নবীন মহতাপের দিকে তাকাইল। বলিল, "হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইল হতভাগা? যা—, ডাক্ রাখুকে! আর অম্‌নি হাবুকেও,—হাবু রায়।"

মুচি-বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ধিক্-পিকে' শরীল্ নিয়ে বল্‌লাম হতভাগা মিন্‌ষেকে—যাস্‌নি, যাস্‌নি, চাষ করতে হবে না এ-বছর। তা সে মর্‌তে-মর্‌তে গেল; বলে, খাবি কি?"

নবীন চুপ করিয়া রহিল।

"খেটে-খুটে' জ্বরে পড়লো। বললাম, আমার এখনও গতর রইছে,—তুই বসে থাক্। ইষ্টিশনের ডাক্তর বললে, উ-রোগের চিকিচ্ছে তোরা ছোট-নোক,—তোরা

পারবিনি করতে। খগেশ্বরের মাদুলিটি এই সেদিন এনে দিলাম বাবু! সেটিও আজ দিয়েছে ছিঁড়ে।"

মাসাবধি কাল হইতে নেপালের গলায় একটি লোহার তৈরী প্রকাণ্ড মাদুলি ঝুলিত। দুশ্চিকিৎস্য ক্ষয়-রোগের সে অক্ষয় কবচটি যে তাহার স্ত্রীর দেওয়া—এতদিনে তাহা বুঝা গেল।

নেপাল তাহার স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে একটা ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই চুপ কর্ না হারামজাদী!"

কিন্তু কথার ধমক্ তাহার সহ্য হইল না। যন্ত্রণায় আর-একবার পিঠ্-মোড়া দিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া মেরুদণ্ডটা সোজা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ধম্কানি খাইয়াও মুচি-বৌ আজ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

"তুই ত' বাঁচ্বার জন্যে আসিস্নি মিন্ষে, তুই মর্বি, মর্বি, তা আমি জানি,—জানি—জানি, খুব জানি, খুব জানি।"

বলিতে বলিতে শিব-মন্দিরের পাথরের সিঁড়ির উপর না জানি কাহার উপর দুর্জ্জয় অভিমানে সে তাহার কপালটা ঠাই-ঠাই করিয়া জোরে-জোরে ঠুকিতে আরম্ভ করিল।

এখনি হয়ত সেও আবার আর-একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে ভাবিয়া নবীন তাহাকে একবার ধম্‌কাইয়া দিতে গেল, কিন্তু চোখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিতেই তাহাকে নিষেধ করিবার মত ভাষা তাহার কণ্ঠে জোগাইল না, যেমন বসিয়াছিল আবার তেম্‌নি নির্ব্বাক হইয়াই সে বসিয়া রহিল। গণেশ পাঁড়ের উপর দুর্জ্জয় ক্রোধে তাহার সমস্ত শরীরের তাজা রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল, চোখ-মুখ নিমেষেই রাঙা হইয়া উঠিল।

নবীন আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "বোস্‌ এইখানে। যাস্‌নে কোথাও।"

ঘরের ভিতর হইতে জামা-জুতা পরিয়াই নবীন বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, রাখহরি, হরেকেষ্ট ও হাবু রায়—তিনজনেই তাহার অপেক্ষায় শিব-মন্দিরের দাওয়ার উপর বসিয়া আছে।

নবীন বলিল, "এই যে রাখু, দেখেছ নেপালকে কি রকম মেরেছে?"

"তাই ত দেখছি ভায়া!" বলিয়া সে একবার নেপালের দিকে তাকাইল।

হরেকিষ্ট বলিল, "নেপাকে নেহাৎ ভাল মানুষ পেয়েছে কিনা! পড়তো আমার পাল্লায়, দেখাতাম বাছাধনকে।"

রাখহরির কাছে একটুখানি আগাইয়া গিয়া নবীন বলিল, "দাও টাকা-ন'টা! তোমার যেদিন দরকার হবে সেদিন আবার দেব।"

টাকা সে সঙ্গেই আনিয়াছিল, ট্যাক্ হইতে ধীরে-ধীরে সেগুলি বাহির করিয়া নবীনের হাতে

দিয়া বলিল, "কিন্তু তোমারই ভরসা ভায়া,—তা নইলে ত..."

হাবু রায় এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এইবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কি জন্যে ডেকেছিলেন দাদাবাবু?"

"তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"কতদূর?"

"প্রথমে ডাক্তারখানায়,—দেখেছ, ওর ঘা'টা একবার দেখেছ?"

নবীন নেপালের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল।

"তারপর থানায়, তারপর আদালতে।"

হাবু উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "চলুন। অনুমানে যা এঁচেছিলাম—ঠিকই হলো। ক'জন চাই? চলুন। পথেই সব কথাবার্ত্তা হবে।"

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ঠিক হয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছ নাকি হাবু? জান্‌লে কেমন করে?"

"হাওয়ায় খবর যায় দাদাবাবু, এ-সব খবর আমাদের কাছে হাওয়ার মুখে ছোটে।"

হাবু সহাস্যে একবার এদিক্-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "চল্ রে চল্ নেপা চল্! ওঠ্! মার ত' খেয়ে এলি বেটা খুব,—এইবার দেখি—"

হরেকিষ্ট সহসা হাত-জোড় করিয়া নবীনের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি কি ওকে সঙ্গে নিয়েই……নিজে… আপনি …?"

হাবু বলিল, "এতক্ষণ ধরে' তবে আর শুনছিস কিরে আহাম্মুক ?"

হরেকিষ্ট তাহার চোখদুইটা বিস্ফারিত করিয়া হেঁট-মুখে নবীনের জুতার উপর তৎক্ষণাৎ তাহার হাতখানি ঠেকাইয়া তাহাই একবার নিজের মাথায় বুলাইয়া লইয়া কহিল, "ঠিক্! এমনি না হ'লে কি আর দস্যির দবন হয় আজ্ঞে? এমনি না হলে কি আর জমিদার…"

মহতাপকে কাছে ডাকিয়া নবীন কহিল, "বাবা শুধোলে কিচ্ছু বলে' কাজ নেই। বলো, এম্‌নি কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেছে। বুঝলে ?"

ছেলেটাকে কোলে লইয়া মুচি-বৌ তাহাদের পিছু-পিছু চলিতেছিল। নবীন পিছন ফিরিয়া তাহাকে একবার ধম্‌কাইয়া দিল।

"তুই কেন আসছিস আমাদের পিছু-পিছু? যা—বাড়ী যা!"

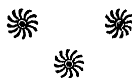
পশু নাপিতের দরজাটা পার হইয়া নবীন একবার পিছন ফিরিল।

মুচি-বৌ তখনও একদৃষ্টে সেইদিক পানে তাকাইয়া আছে।

হাবু বলিল, "মামলাটা তা'হ'লে আগাগোড়া সাজিয়েই নেওয়া যাক্!"

নবীন কি যেন ভাবিতেছিল, জবাব দিল না। মনে হইল, কথাটা যেন সে শুনিতে পায় নাই।

চলিতে চলিতে আর-একবার সে পিছন ফিরিয়া চাহিল।





কিন্তু সীতাপতিবাবু সেকথা শুনিলেন।

থানার জমাদার-সাহেবকে সেদিন টুপি-পায়জামা পরিয়াই সরকারী কি-একটা কাজে পাশের গাঁয়ে আসিতে হইয়াছিল, সীতাপতিবাবুর সহিত দেখা না করিয়া তিনি ফিরিতে পারিলেন না। এমন তিনি পথ ভুলিয়া প্রায়ই আসেন।..... হাজার হোক্, এ-গাঁয়ের জমিদারটি বড় ভালমানুষ,—অতিথি-সৎকারের চক্ষুলজ্জা আছে······এই কথাটি সাহেবের মুখে বহুবার শোনা যায়।

সীতাপতিবাবু তাঁহার সেই ছোট বাগানটিতে নিজের হাতে কয়েক্ চারা কফি বসাইয়াছিলেন। শীতের সকালে রৌদ্র উঠিতেই কচি কফির পাতায় ঢাকা দিতে হয়। প্রভাতে সেদিন তিনি বাগানে ঢুকিয়াই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছোট চারার সবুজ কচি পাতাগুলির উপর বিন্দু-বিন্দু শিশির জমিয়াছে। লেবু-ডালিমের

পাতায়-ফলে প্রভাতের রঙিন্ আলো ঝিকৃমিক্ করিতেছিল......

বাগানের মাঝে রক্তজবার ফুল ফোটে। পুরনো বেলগাছটার পাকা-বেলের সুখ্যাতি আশ-পাশের দু'পাঁচটা গাঁয়ের লোকও করে।

অসভ্য এই বুড়ো গাছটাকে কাটিয়া ফেলাই উচিত,—বলিয়া দাদা সেদিন তাঁহাকে এক চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিটার জবাব এখনও দেওয়া হয় নাই। গাছটি বহু-কালের প্রাচীন। ধরিত্রীর সহিত যাহার এই এতকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়,—খেয়ালের ঝোঁকে একটি দিনে তাহাকে শেষ করিয়া দিতে তাঁহার মন সরে না।

কি বলিয়া যে জবাব দিবেন তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন।

হংস অধিকারী সেদিন বলিতেছিলেন যে, এই গাছে নাকি অনেককালের বুড়া এক ব্রহ্মচারী বাস করেন। পরণে তাঁহার গেরুয়া বস্ত্র,—পাকা পাকা লম্বা দাড়ি! মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতে যেদিন তাঁহার রাত একটুখানি বেশি হইয়াছিল সেইদিন বুড়া-বেম্মচারীর খড়মের চট্‌পটানি

তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। বাউল ভট্‌চাজও সেদিন নাকি তাঁহাকে চিম্‌টা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে আকাশ-পথে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছে!

এবং সেটি নাকি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের পয়মন্ত গাছ।

সীতাপতিবাবু ঠিক করিলেন, চিঠির জবাবে দাদাকে তিনি এই প্রত্যক্ষ সত্য কথাটিই লিখিয়া দিবেন। মিথ্যা একটা অজুহাত দেখাইয়া লাভ কি!

লোহার নাল-বাঁধানো সিপাহী-বুটের তলায় কচি একটি কফির চারাকে মাড়াইয়া দিয়া, জমাদার-সাহেব অনেকক্ষণ হইতেই তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন।

সেদিকে সীতাপতিবাবুর নজর পড়িতেই কহিলেন, "এই যে! খবর কি?"

জমাদার-সাহেব কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন।

"আর দেখ্‌ছেন কি মশাই,—করডডায় একটা সিঁদ্-চুরি হ'য়ে গেছে······চৌকিদার-বেটারা সব—"

কথাটা তিনি শেষ করিতে পাইলেন না।

সাহেবের পায়ের দিকে তাকাইবামাত্র সীতাপতিবাবু হাঁহাঁ করিয়া তাঁহাকে একপ্রকার ঠেলিয়াই ক্ষেত হইতে সরাইয়া দিয়া নিজেও সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

বৈঠকখানার উপরে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "বলুন। তারপর—খবর কি? বসুন।"

বারান্দার চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া জমাদার সাহেব কহিতে লাগিলেন, "খবর আর কি! এম্‌নি এলাম। বাড়ীর পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি, ভাবলাম—বাবুর খবরটা একবার নিয়েই যাই। আপনার বাড়ীতে চা খেয়ে গিয়ে সেদিন আমি বহুৎ সুখ্যাতি করলাম, বুঝলেন? ফাইন্ চা। 'দার্জ্জিলিং টি' কি আপনার কলকাতা থেকেই আসে?"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "না, না, ও আমি খাই-টাই না মশাই! বাড়ীর সব ছেলেপুলেগুলো খায়, আর এই আপনাদের জন্যেই—এই বাজার থেকে নিয়ে আসা।"

জমাদার-সাহেবের জন্য চা আসিল।

পেয়ালায় চুমুক দিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আঃ ফাইন্!……হ্যাঁ, বলছিলাম কি, আপনারা রাজা-লোক,

ও আর কতক্ষণ, দিন্-না ও-বেটা পাঁড়েকে একেবারে জন্মের মতন পথ দেখিয়ে,—দিন্-না! তারপর আমরা দেখে' নেব।"

কথাটা তাঁহার বোধহয় ভাল লাগিল না। ঈষৎ হাসিয়া তিনি কফির চারা ঢাকা দিবার জন্য বাগানে নামিয়া গেলেন।

চা খাইতে খাইতে জমাদার সাহেব আবার কহিলেন, "আপনার ছেলেকেও সেদিন বললাম এই কথা। তাঁর ত' এ বিষয়ে খুব উৎসাহ দেখি।"

বাগানের ভিতর সীতাপতিবাবু মাথা হেঁট করিয়া শালপাতার ঠোঙ্গাগুলি কুড়াইয়া জড় করিতে লাগিলেন, প্রত্যুত্তরে অন্যমনস্কের মত আবার ঈষৎ হাসিলেন।

"সেই মুচিবেটার 'কেস্'টা নিয়ে আপনার ছেলে যেদিন গেলেন থানায়, আমিই ছিলাম সেদিন থানার 'ইন্-চার্জ্জ'—নিস্‌পেক্টর্‌বাবু মফঃস্বলে বেরিয়েছিলেন। ডায়েরীটা খুব খিঁচেই লিখেছি।" এই বলিয়া খুব খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গরম চা'টা তিনি কোঁৎ কোঁৎ করিয়া একটানে

অনেকখানা গিলিয়া ফেলিলেন, তাহার পর আবার সুরু করিলেন,—"আদালতের সাক্ষী-সবুদ্ ওইখান থেকেই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়া গেল। আপনার ছেলে বেশ 'ইন্‌টেলিজেণ্ট্', বুঝ্‌লেন কিনা, বেশ চালাক-চম্বা, বেশ তুখোড়্, খুব ফড়্‌ফড়ে'—বুঝলেন কিনা। আপনার ছেলে······হেঁ হেঁ······"

পেয়ালাটি শেষ করিয়া তিনি নামাইয়া রাখিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাহ'লে আসি—নমস্কার!"

সীতাপতিবাবু পিছন ফিরিয়াই ঘাড় নাড়িলেন।

"নমস্কার।"

কিন্তু এই জমাদার-সাহেবটি চলিয়া যাইবার পর তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ নবীনকে ডাকাইয়া খুব একচোট্ জোরে জোরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

"শূয়োর, উল্লুক, পাজি, ছুঁচো, গাধা,—সব মাটি করবি দেখ্‌ছি তুই সব লণ্ডভণ্ড করে' ফেল্‌বি তুই! দাদা যদি শুন্‌তে পায় এ-কথা······। কী দরকার ছিল তোর

নেপা মুচিকে নিয়ে থানা-আদালতে নিজে যাবার ?...... ও ন্যাংটা ছোটলোকের সঙ্গে গুণ্ডামি করে' কি লাভ হবে তোর শুনি ?"

নবীন ধীরে-ধীরে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

নবীন প্রায় অধিকাংশ সময় ঘরের বাহিরেই কাটায়। বাড়ী ঢুকে মাত্র খাবার প্রয়োজনে।

মা সেদিন দুপুরে তাহাকে শুনাইয়া দিলেন,—

"ওরা তোর চোদ্দ-পুরুষের কে, যে ওদের হয়ে নালিশ মোকদ্দমা করে' বেড়াচ্ছিস্ ?"

নবীন আধ-খাওয়া করিয়া সেদিনও উঠিয়া গেল।

বৌ তাহার রোজ ভাবে যে কথাটা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবে। মেয়েছেলে লইয়া ঘর-সংসার করিতে হইলে পরের দায় নিজের ঘাড়ে চাপানো ভাল নয়, বনের সন্ন্যাসী হয়,—সে এক আলাদা কথা......

কিন্তু তাহাদের দেখাশুনা যখন হয়, রাত্রি তখন

অনেক। সহসা ঘুম হইতে জাগিয়া ওঠে। কথা বলিবার অবসর থাকে না। সবদিন হয়ত ভালও লাগে না।

গাঁয়ের পূব্‌পাড়ায় রাখহরির গোয়ালের পাশে তাহার দাদা বঙ্কিম, নিজের হাতেই ছোট একটি ঘর তৈরী করিয়া লইয়াছিল। সংসারে আস্থা তাহার খুব কম। সর্ব্বাঙ্গে ধবল-কুষ্ঠের দাগ। নিজের বুকের উপর বাঁহাতখানি এবং হাঁটুর উপর ডান-হাত রাখিয়া ডুগি-তব্‌লার পরিবর্ত্তে শরীরটাকেই বাজাইতে বাজাইতে বাউলের সুরে সে গান গায়—

"—জপ মন ভোলা!
ভোলার দয়া চা'স্‌ যদি কেউ
সার কর রে গাছের তলা!"

আবার হয়ত তৎক্ষণাৎ সে গানটা থামাইয়া দিয়া মনের আবেগে গাহিয়া উঠে—

"গাঁজা তোর মহিমা এ কি
আমি দিন-দুপুরে স্বপন দেখি।"

হরদম গাঁজা খায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে,—আর চব্বিশ ঘণ্টা সেইখানে পড়িয়া থাকে। অপরিচিত কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, নাম—"শ্রী বঙ্কিমানন্দ। ওই আনন্দটুকুই যা-কিছু! দেখ না,—অভয়ানন্দ, পরমানন্দ, —সব সিদ্ধপীঠ লোক বাবা! চুরি করলেই চোর, ডাকাতি করলেই ডাকাত, হাওয়াগাড়ী চড়লেই বড়লোক, আর খেতে না পেলেই গরীব।"

রাখহরিকে ডাকিবার জন্য হাবুকে তাহার ঘরে পাঠাইয়া দিয়া নবীন সেদিন সন্ধ্যায় এইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কলিকায় তামাক সাজিয়া আগুনের সন্ধানে বঙ্কিম তখন এদিক্-ওদিক্ হাৎড়াইতেছিল, নবীনকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এসো বাবা এসো! বসো বসো!"

নবীন দাঁড়াইয়াই রহিল।

মাথার উপর মাচায় কতকগুলা খড় তোলা ছিল, সেইখান হইতে আঁটি-কয়েক্ খড় টানিয়া লইয়া বঙ্কিম

পাশের গোয়ালে চলিয়া গেল। কেরোসিনের কুপিটা সেইখানেই জ্বলিতে লাগিল।

গরুতে-বাছুরে ছাগলে-ভেড়ায় বঙ্কিমের হেফাজতে গোয়ালে প্রায় দশটি জানোয়ার গায়ে-গায়ে বাঁধা থাকে।

খড়গুলি পাইয়া অন্ধকারেই তাহারা হুটোপুটি স্বরু করিল।

বঙ্কিম ফিরিয়া আসিয়া কেরোসিনের আলোয় খড়ের একটি নুটি জ্বালিয়া কহিল, "রাখ্ তোমায় ভায়া বলে, আর আমি বলি বাবা।"

এই বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

তারপর হাসি থামিলে আবার বলিল, "তুমিও বাবা, এও বাবা, সে-ও বাবা, আর সব-চাইতে বড় বাবা হলো গিয়ে—"

সুমুখে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া বঙ্কিম বলিল, "সেই পাগ্লা-বাবা ভোলানাথ! দুর্জ্জয় বেটার সাহস কিন্তু! ঘর-দোর্ ছেড়ে-ছুড়ে' ছাই-ভস্ম মেখে' সন্ন্যেসী হলো—ঠিক আমারই মতন! বুঝলে নবীন? ওই-বেটাই খাঁটি, আর-সব দেব্তা-টেব্তা, সব ঝুট্!"

হাবু ও রাখহরি দুজনেই আসিয়া দাঁড়াইল।

নবীন বলিল, "কালকার দিনটা কোনরকমে চালাও রাখহরি,—কোথাও কিছু হলো না।"

রাখহরির মুখখানি হঠাৎ বিমর্ষ হইয়া গেল। বলিল, "তাইত' ভায়া, কাল একটা ভাল উকিল না দিতে পারলে—"

হাবু রায় বলিল, "হরিশ-মোক্তারকে বলে' এসেছি আমি। উকিলের সে কান কাটে। উকিল চাই না, হরিশবাবুকে দিলেই হবে।"

রাখহরি তাহার দাদার সেই ছোট ঘরখানির উপর উঠিয়া গিয়া বলিল, "তারও ত খরচ আছে একটা। আচ্ছা, এসো উঠে' এসো—ভেবে দেখা যাক্।"

নবীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, এখানে আর বসব না। এসো তুমিই এসো।"

বঙ্কিম এক কোণে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, রাখহরি বলিল, "কই দে দেখি দশটা টাকা, কাল-পরশু দিয়ে দেব।"

বঙ্কিম আবার হাসিয়া উঠিল। বলিল, "টাকা কোথা

পাব আমি? আমার ঘর না সংসার, সন্ন্যাসী মানুষ, টাকা কোথা পাব আমি? যার টাকা আছে তাকে বলে বড়লোক, আর যার টাকা নেই,—তাকে বলে গরীব।”

রাখহরি রাগিয়া উঠিল।

“রাখ্, তোর ক্ষ্যাপামি রাখ্! দিবি ত' দে বলছি দে। নইলে জানিস ত' আমার রাগ,—দেব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মেরে কোন্‌দিন—তাহ'লেই বুঝ্‌বি মজা।”

নবীন ডাকিল, “টাকা ও কোথা পাবে রাখু? এসো তুমি নেমে এসো।”

“তা আমি শুনব কেন হে ভায়া? এই খামারে চব্বিশঘণ্টা থাকে,—রাত-বিরেতে কত টাকার ধান বিক্কি করে তা কে দেখতে যায়? সব জানি, আমি সব জানি,—বার কর্ বলছি টাকা বার কর্—তা নইলে তোর ওই উদ্‌ভট্টি সন্ন্যেসীগিরি আমি ঝেড়ে' দেব একদিন।”

এই বলিয়া রাখহরি সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

তিনজনে রাস্তায় আসিয়া পৌছিল। রাখহরি বলিল, “আছে ভায়া, এক উপায় আছে। সাধু বেনে এই

মরশুমে কিছু করে' নিলে। ওকে একবার চেপে ধরলে কিছু বেরিয়ে আসে,—অন্তত কালকের খরচটা—"

"কি রকম ?"

রাখহরি তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, আজকাল এই ধান-কাটার সময় সাধু বেনে রোজ অন্তত পনর-কুড়ি সের বরবটি ও রমা কলাই নুন-লঙ্কা দিয়া সিদ্ধ করে এবং সেগুলা মাঠে লইয়া গিয়া ধান-কাটা মুনিষজনের কাছে বিক্রি করিয়া আসে;—'কম্‌সে কম্' দশ-বার টাকার বিক্রি ত' নিশ্চয়ই। কিন্তু দশ-বারটা নগদ টাকা সে যেমন হাতে পায় না, তেমন তাহার পরিবর্ত্তে যে-বস্তু সে পায়, আজকালকার 'মাগ্‌গি-গণ্ডার' বাজারে তাহার দাম অনেক। এমন কি পাকা ধানগুলা সে নিজে বহিয়া আনিতে পারে না, তাহার সেই বিধবা মেয়েটা মাঠ হইতে প্রকাণ্ড ধানের বস্তাগুলা মাথায় করিয়া কতবার যে ঘরে রাখিয়া যায় তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। এক মাসের জমা-বাবদ জমিদারকে অন্তত কুড়িটা টাকা তাহার দেওয়া উচিত।

"চল।"

রাস্তার ধারে ছোট একটি খড়ো-ঘরের বাহিরের দিকে দরজা ফুটাইয়া সাধু বেনে তাহার নিতান্ত ছোট-খাটো ঝাল-মসলার দোকানটি চালায়। দোকানের দরজায় তখন কপাট পড়িয়াছে।

হাঁক্-ডাক শুনিয়া ভিতর হইতে দরজা খোলার শব্দ হইল।

নবীন ধীরে-ধীরে বলিল, "কাজ নেই রাখু, চল। এর কাছে কিছু হবে না।"

হবু তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া চুপি-চুপি কহিল, "জরুর হবে। দাঁড়ান।"

সাধু নিজেই বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু এমন অসময়ে এই এতগুলি লোককে তাহার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রথমেই সে একটুখানি ভয় পাইয়া গেল। কালো রঙের শীর্ণ দুর্ব্বল বাঁ-হাতের দুইটি আঙ্গুলের ডগায় ধরিয়া কেরোসিনের যে জ্বলন্ত কুপিটি সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সেটি সে তাহার চৌকাঠের উপর ধীরে-ধীরে নামাইয়া রাখিয়া সকলকে একটি করিয়া প্রণাম করিল; হাত জোড় করিয়া বলিল, "কি হুকুম আজ্ঞে?"

কাঁচা-পাকা গোঁফগুলা তাহার মুখের উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নীচের-পাটির উঁচু দাঁতদুটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে নাই, অন্ধকারেও সে দুটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠে কলাই বেচে' পয়সাকড়ি আজকাল নাকি বেশ পাচ্ছ শুন্‌ছি—"

সাধুকে শীত একটুখানি বেশি লাগিতেছিল, গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিটার উপর কোঁচার খুঁটটা টানিয়া লইয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বলিল, "বেশি আর কোথা আজ্ঞে, বাপ্‌-বেটিতে সারাদিন খাটি,—আনা-আষ্টেক হয় রোজ!—পয়সাই ত' সব আজ্ঞে, সংসারে পয়সা বিনে আর কি আছে বলুন?"

কপালের উঁচু হাড়ের নীচে দুইটা গর্ত্তের ভিতর হইতে নিতান্ত ছোট এবং উজ্জ্বল চোখ দুইটা তাহার সেই কেরোসিনের কুপির আব্‌ছা-অন্ধকারেও ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। মনে হইল যেন সে এই দুইটা চোখের দৃষ্টি দিয়া দুনিয়ায় একমাত্র পয়সা ছাড়া আর-কিছুই দেখিতে পায় নাই।

রাখহরি বলিল, "জমিদারকে জমা লাগবে সাধু, জমা না দিয়ে তুমি কলাই বেচ্‌তে পাবে না। রোজ আট-দশ টাকার ধান—এ কি মুখের কথা বাবা?"

হাবু বলিল, "ধান কেউ নিজের মাঠের দেয় না তা আমি জানি। পরের মাঠের আঁটি ঝেড়ে' তোমার বস্তা বোঝাই করে' দেয়—আর তুমি তাই নিয়ে এসো ঘরে। সব চুরি—বাবা সব চুরি।"

কথাটা সত্য। সাধু বেনে বেশ একটুখানি ঘাব্‌ড়াইয়া গেল। ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া মুখে কোনও কথা না বলিয়াই সে তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া নবীনের কাছে তাহার সেই কঙ্কালসার হাতখানা বাড়াইয়া বলিল, "ধরুন!"

সাধুর হাতখানা থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, বলিল, "আপনার পান খেতে এই যা দিচ্ছি—আজ্ঞে এই······ আনা-চারেক্······"

রাখহরি বলিল, "আনা-চারেক্ কি রে বেটা? আনা-চারেক্ কি?"

হাবু আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইল না।

নবীন চীৎকার করিয়া উঠিল—

"হারামজাদা, পাজি,—চোর-কাঁহাকা! চল্—দেখি, —চুরি-করা কত ধান আছে তোর ঘরে, এক্ষুনি চালান্ দেব থানায়। চল্—"

রাখহরি ও হাবুকে লইয়া স্মুখের খোলা দরজা দিয়া হুড়মুড় করিয়া নবীন তাহার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সাধুর হাত হইতে কেরোসিনের ডিবেটা একপ্রকার কাড়িয়া লইয়াই রাখহরি সর্ব্বাগ্রে ভিতরের চালার দিকে আগাইয়া গেল।

চালার একপাশে পাকা ধানের প্রকাণ্ড একটা স্তূপ দিনে-দিনে জড় হইয়াছে। রাখহরি সেদিন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিল। বলিল, "দেখে যাও হে, দেখে যাও, বেটার কাজ দেখে যাও।"

গাদা হইতে একমুঠা ধান তুলিয়া লইয়া আলোর কাছে মনযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে করিতে হাবু বলিল, "এ যে বাবা আমারই মাঠের সিঁদুরমুখী ধান! এ যে 'চিন্‌বস্ত' সাধু! তুমি আর যাবে কোথা বাবা?"

রাখহরির আর বিলম্ব সহ্য হইল না। সাধু তখন

উঠানের হিমে বসিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "চল, চৌকিদারের জিম্মে করে' দিয়ে আসি তোমাকে চল।"

এতক্ষণে মনে হইল যেন সাধুর বিধবা মেয়েটা পাশের একটি ছোট ঘরের খিল খুলিয়া অন্ধকার চালায় আসিয়া দাঁড়াইল।

নবীন বলিল, "রাখু, হাবু, চলে' এসো তোমরা,—আমি দেখে নেব এরপর।"

তাড়াতাড়ি উঠানটা পার হইয়া সে বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল।

অন্ধকার উঠানের উপর একেবারে হামাগুড়ি দিয়া সাধু তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"দেখে শুনে একটি আধুলি বাবু এই আমি আপনাকে দিচ্ছি পান খেতে—গরীব লোক বাবু, মাপ্ করুন আপনি......"

পান খাইবার জন্য আর বেশি যে উঠিবে না নবীন তাহা জানিত। পা দুইটা তাহার ছাড়াইয়া লইয়া সে বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

রাখহরি কাছে আসিয়া বলিল, "কি হয় তাহ'লে ভায়া, কি হবে ?"

পথ চলিতে চলিতে নবীন বলিল, "কি হবে তা আমি কি জানি ?"

হন্ হন্ করিয়া সে আরও খানিকটা আগাইয়া গেল।

"এখানে আসাই যে আমার উচিত হয় নি।...... এমনি ছ্যাচ্ড়ামি করে' আমি যার-তার কাছে আদায় করে' বেড়াই, আর তুমি বসে বসে মোকদ্দমা চালাও। ভারি যেন আমারই গরজ !..."

হাবু ও রাখহরি দুজনেই তাহার পিছু-পিছু আসিতেছিল।

নবীন আবার বলিল,—

"মোকদ্দমা তোমায় চালাতেই হবে রাখু, তা সে তুমি যেমন করেই চালাও। যাও তুমি যাও, আর এসোনা, টাকার চেষ্টা দেখগে।"

"তাই দেখি ভায়া—" বলিয়া রাখহরি ফিরিল।

হাবুও ফিরিবার জন্য ইতস্তত করিতেছিল।

নবীন তাহাকে সঙ্গে ডাকিয়া লইল। স্যাক্‌রাদের

ঘরগুলা পার হইয়া আসিয়া নবীন বলিল, "তোমার ভয় নেই হাবু, তোমাকে মোকদ্দমা আমি নিজে করিয়েছি। দিন কবে পড়েছে বল্‌লে?—পরশু, নয়?"

হাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ পরশু। কিন্তু আমি ভয় করি না দাদাবাবু,—আমি সে ছেলেই নই।"

"আচ্ছা, বিনোদ কুলুকে দিয়ে যে দু'নম্বর করিয়েছ, সে দুটোর দিন?"

"তার এখনও অনেক দেরি। পঁচিশে।"

"রত্‌না বাগ্‌দিকে দিয়ে যেটা করালে, সেটা বুঝি পনেরই?—হ্যাঁ, ও-সব আমার মনে থাকে না হাবু, দুএকদিন আগে থেকে' মনে করিয়ে দিও।"

হাবু ঘাড় নাড়িল।

"আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, নেপাল যে অসুখে পড়লো, সে কি সেদিন ওই-ব্যাটার মার খেয়েই, না ও-অসুখ ওর আগে থেকেই ছিল।"

হাবু বলিল, "মার খেয়ে ত' নিশ্চয়ই।......অসুখ আবার আগে থেকে থাকে কখনও?"

দুজনেই নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ উঠিতেছিল।

নবীন কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য হাবুর দিকে মুখ ফিরাইতেই সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল তাহার বগলের নীচে কি যেন একটা ঝক্‌ঝকে' হাতিয়ার লুকানো রহিয়াছে। বলিল, "এ কি? এ কি জন্যে হাবু?"

হাসিতে হাসিতে কাঠের বাঁট-দেওয়া ধারালো ইস্পাতের টাঙ্গিটি সে তাহার গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া নবীনকে দেখাইল।

"এক এক চোটে দু'দুটো মানুষ।......এ না হ'লে কি আর বেরোবার জো আছে আজকাল। দুষ্‌মন সব আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। আপনিও একটা রাখুন, বুঝলেন?"

এত রাত্রে বাক্সের চাবির যে কি প্রয়োজন নবীনের স্ত্রী তাহা বুঝিল। বলিল, "না, চাবি আমি দেব না।"

নবীন বলিল, "অবিশ্বাস করছ ?"

স্ত্রী তাহার ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "আ—। কি বিশ্বাসের লোকটি গো,——সাধু স্যাওড়াগাছ !"

নবীন বলিল, "দাও। আবার দেব।"

"হ্যাঁ, তা আবার দেবে না ! দিয়েছ যে কত !"

নবীন মিছামিছি একবার বাক্সর কাছে আগাইয়া গেল। স্ত্রী তাহার বাক্সটার উপর একেবারে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং উপুড় হইয়া দুই হাত দিয়া সেটাকে আগলাইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "না—না, না দেব না, না।······আমায় খুন কর, তারপর নিয়ে যাও, মর, যা খুশী তাই কর।"

নবীন সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া তাহার বিছানায় গিয়া শুইল। বলিল, "বেশ। দেবে না তাই বল, অত কথায় কাজ কি ?"

"না, দেব না। পরের জন্যে আমার গায়ের রক্ত দিতে পারব না—পারব না।"

বাক্স ছাড়িয়া বৌ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি আমার হাড়ে হলুদ দেবে, পরের দায়ে আমার

সব যাবে—সব যাবে। মা গো মা, এমন লোক ত' কোথাও দেখিনি মা, এর চেয়ে আমায় কেটেকুটে নদীর জলে ভাসিয়ে কেন দাওনি মা!"—বলিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না সুরু করিল।

নবীন আর একটি কথাও বলিল না। ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল কিছুই টের পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিতেই সর্ব্বপ্রথমেই বৌ-এর নজরে পড়িল—তাহার বাক্স খোলা! নবীন কোন্ সময় উঠিয়া চলিয়া গেছে। মেয়েদুটা তখনও ঘুমাইতেছিল।

বৌ-এর গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ্ করিতে লাগিল......



মাঠের ধান ঘরে আসিল।

পাঁড়েদের সেই জ্বরো-ছেলেটাকে গাঁয়ের পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। বছরের এই সময়টায় তাহার জ্বর ছাড়ে। দেবেন-পণ্ডিতের কুলগাছে কুল পাকে। বসন্তের হাওয়া বয়······

সে-বৎসর গ্রামের ভিতর বিস্তর রং-বেরঙের পাখীর আমদানী হইয়াছিল।

'তুগ গো-বাংলা'র পাঠশালাটি রাশু-ভট্‌চাজ্‌ই চালায়।

দেবেন-পণ্ডিত বাঁশের একটা নূতন তীর-ধনুক্ তৈরী করিয়াছে। উঠানের কুল-তলায় সে সারাদিন বসিয়া থাকে। মাকে বুঝাইয়া বলে, ইস্কুলে যে বড় খবরের কাগজটা আসে, তাহাতেই সে নাকি দেখিয়া আসিয়াছে,—'পিথিমি'র মধ্যে এ-বছর কুল আর কোথাও হয় নাই,—দেশ-বিদেশ হইতে তাই এত পাখীর আমদানী। আর······

"—সব-বেটা কুল খায়……"

কিন্তু মিছাই আসিল। দেশে আর বাছাধনদের ফিরিয়া যাইতে হইবে না। দেবেন বলে,—

"অদ্ধেকের উপর আমি মেরেই ফেল্‌ব !"

কানা-বিষ্টুর বাঁজা-গাছটায় ছাড়া, গাঁয়ের প্রায় সব আমগাছেই তখন মুকুল ধরিয়াছে।

এমনি দিনে রাখহরি-হরেকিষ্টর মোকদ্দমাটা হঠাৎ ফাঁসিয়া গেল। গণেশ-কিশোরীর কিছুই হইল না।

তাহাদের আনন্দ-আস্ফালনের আর সীমা রহিল না। গণেশ পাঁড়ে যার-তার কাছে গোঁফ চুম্‌রাইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"আরও ক'শালার মাথা ফাটাই তোরা শুধু চেয়ে-চেয়ে দ্যাখ্‌।……আমার হবে কচু ! আমার হবে ঘণ্টা !…… "

নবীনের সর্ব্বাঙ্গ রাগে গুর্‌ গুর্‌ করে। বলে,— "তাই দেখাই যাক্‌।"

প্রাণের ভয়ে ভীরু দু'একটা গাঁয়ের লোক গণেশের কথায় সায় দেয়। নবীনের কানে সে-কথা আসে। তাহাদের কাছে ডাকিয়া বলে, "ভাল তোদের কস্মিনকালেও হবে

না তা জানি। এ-গাঁয়ের বাস তোরা উঠিয়ে দে, কোথাও চলে যা, বেরো আমার জমিদারী থেকে—। দূর্ হ'!"

নবীনের নামে পাল্টা-মোকদ্দমা গণেশ কম করে নাই। কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণের অভাব,—সেটা তাহার বলা-কথা; কারণ, ধর্ম্মাধিকরণের কাছে বহুপূর্ব্বেই সে আর্জ্জি করিয়া রাখিয়াছে যে, জমিদার অত্যাচারী, বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে ঘর জ্বালাইয়া মারিয়া ফেলিবে, গ্রামের দরিদ্র প্রজা সে ভয় রাখে।

কিশোরী পাঁড়ে ইষ্টিশানের ফটকের চাকরিটি তখনও ছাড়ে নাই। খাবার ছুটি পাইয়া সেদিন সে ঘরে আসিয়াছে, গণেশ বলিল, "দে এবার তুই কিছু টাকা দে। আমি বহুৎ দিলাম। তিন-চার শ' গেল আমার।"

"এ ত ভারি মুস্কিলে ফেল্লি তুই! টাকা আমি পাই কোথা?"

গণেশ বলিল, "ও সব বল্‌লে চল্‌বে না—ও-সব বাজে-কথা আমি শুন্‌তে চাই না। মোকদ্দমা একা আমার নয়—তোর নামেও। টাকা চাই—টাকা দে, টাকা দে।"

পাঁচ-সাতটা মোকদ্দমায় আসামী হইয়া এখন আর সরিয়া দাঁড়াইবারও উপায় নাই। কিশোরী পাঁড়ে মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল।

রান্নাঘর হইতে কিশোরীর বৌ-এর ঝন্‌ঝনে' গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল।

"—ও মাগো! আয় রে বাঘ না গলায় লাগ্‌! ভাস্থরের কথা শুনলে কি হয়! কেনে, উ কেনে টাকা দিতে যাবে,—কিসের লেগে? লাগ-লাগ্‌-ভেল্‌কি লাগাতে গেলি কেনে? লালিশ-মকদ্দমা করতে গেলি কেনে?"

"ট্যাঁক্-ট্যাঁক্ করিস না;—তুই চুপ কর্ শালী, তুই চুপ কর্।"

এই বলিয়া গণেশ তাহার ভাদ্র-বধূকে চুপ করাইয়া দিয়া কিশোরীকে একটুখানি বাহিরে ডাকিয়া আনিল।

"আমার ত' এরই মধ্যে বিঘে-চারেক্ গেল,—দে তুইও দে চার বিঘে।"

কিশোরী কিছুতেই রাজি হয় না। বলে,—"খাব কি দাদা? জমি যে মোটে সাত বিঘে।"

গণেশ বলিল, "এ সময় তা বললে চলে না, আমারই কোন্ পঞ্চাশ্ বিগে! জেল-কয়েদ নাহয় খাটতে রাজি আছি—কিন্তু নেমেছি যখন, শেষ পর্য্যন্ত লড়বই। আমরা জাত কন্‌জ্যে। আমাদের রাগ ভারি খারাপ।"

কিশোরীকে রাজি হইতে হইল।

"কিন্তু নেবে কে?"

গণেশ বলিল, "আমি নেব। আবার কে নেবে? লেনেওয়ালা-মরদ্ আবার কোন্-বেটা আছে রে এ-গাঁয়ে? ......জমি তুই চৈতনের মায়ের নামে লিখে দিবি। বাস্! জমি দিয়েই খালাস্! নালিশ করতে হয়, আপিল করতে হয়, আমি করব। মোকদ্দমা চালাতে হয়—আমি চালাব। চুরি করতে হয়, ডাকাতি করতে হয়—হাম্ করেঙ্গা। আলবাৎ করেঙ্গা।—"

দিন-দুই পরে একদিন শহরের রেজেষ্ট্রী-আপিসে

গিয়া জমি চার বিঘা কিশোরী লিখিয়া দিল বটে, কিন্তু বাকি তিন বিঘা জমিতে কি করিয়া যে কি হইবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। বলিল,—

"শোন্ দাদা শোন্ তবে এক মতলব শোন্ আমার। যা হবে তা একবারেই হয়ে যাক্। দিই ফুটিয়ে চল্ একদিন নব্নেকে শেষ করেই দেওয়া যাক্। বাস্...... হয় এস্পার্, নয় ওস্পার !—

প্রস্তাব শুনিয়া গণেশ পাঁড়ে লাফাইয়া উঠিল।

"ঠিক্! ঠিক্ বলেছিস। জ্বালা-জঞ্জাল চুকে-বুকে' যাওয়াই ভাল। বাহা রে! বাহা রে!"

তৎক্ষণাৎ তাহাদের পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল এই— যে, হাবু রায় তাহাদের নামে যে মোকদ্দমাটি রুজু করিয়াছে, আগামী মঙ্গলবার তাহারই শেষ-শুনানির দিন। নবীন আদালতে যাইবেই, এবং সন্ধ্যার ট্রেণ ভিন্ন সে যে ফিরিতে পারিবে না ইহাও ঠিক। গণেশ কিশোরী তাহার আগেই আদালত হইতে চলিয়া আসিবে। হিঙ্গুলের তীরে গাছ-পালার ঝোঁপ-জঙ্গলের আড়ালে দু'তিনটা লোক লাঠি-সোটা লইয়া অনায়াসে

লুকাইয়া থাকিতে পারে। তাহারাও থাকিবে। ষ্টেশন হইতে গ্রামে ফিরিবার ওই একমাত্র পথ, সুতরাং নবীনকে সেই রাস্তা দিয়া আসিতে হইবেই। হোক্ না জ্যোৎস্না-রাত্রি......

গণেশ বলিল, "অমন চাঁদ আমি কত গণ্ডা দেখেছি... চাঁদ-সূয্যি দুজনাই থাক্ না বাবা! ঠিক্—বাঘে যেমন করে' শিকেরটি ধরে' নিয়ে যায়, মুখে কাপড়টি চেপে' দিয়ে, ঠিক তেমনিটি করে' নিয়ে যাব—উ-ই পেসাদ্‌পুরের ডাঙ্গায়। তার পর খুব্‌লে খুব্‌লে কাটব, কেটে' বস্তায় পুরব, পুরে' হিঙুলের চোরাবালিতে পুঁতে দিয়ে—বাস্, হাত-পা ধুয়ে বাড়ী ফির্‌ব। জ্বালা-জঞ্জাল চুকে যাবে এক—দিনে।"

শশী মোড়ল আবার আসিল।

বলে,—"চাষ করব আজ্ঞে......আবার।"

কুঁড়ি ধরিবার আগে বেলফুলের গাছগুলি সীতাপতি-

বাবু একবার ছাঁটিয়া ফেলিতেছিলেন। গাছ-কাটা প্রকাণ্ড কাঁচিটা থামাইয়া শশীর মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন, "তুই সবই করবি।"

পশ্চিমমুখে শশী দাঁড়াইয়াছিল। সূর্য্যের আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেই সে তাহার একটুখানি কাছে সরিয়া আসিল। বলিল, "না হুজুর, নিশ্চয় করব আমি। জমিটি আপনি আর-একবার দিন। কিন্তু এবার আর আলু-পেঁয়াজ নয়, এবার কচু। বিঘেয় তিনটি শ' টাকা লাভ।"

সীতাপতিবাবুর হাতের কাঁচি আবার চলিতে লাগিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "লাভ যা করবি তা আমি জানি। এ বুদ্ধিটি কে তোর মাথায় ঢোকালে বল্ দেখি?"

শশী বলিল, "শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলাম হুজুর, আজই ত ফিরছি সেখান থেকে।"

সীতাপতিবাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, "তাই বল্।"

"আজ্ঞে হাঁ, এই ধান-চালের সময়টায় মেয়েছেলে সব রেখে দিয়ে এলাম সেইখানে। সুম্মুন্দিকে বললাম

বলি, শুন্‌ছো হে ভায়া, এখন আর এদের নিয়ে যেতে পারব না আমি, মামার ঘরে দিনকতক্‌ থাক্‌ ছেলেপুলে-গুলো।' বুঝ্‌লেন? তাতে সুম্মুন্দি বললে কি,—'বেশ ত' বেশ ত'।' আমিও বাঁচলাম হুজুর। খেয়ে-মেখে দিনকতক টিস্‌কিয়ে আসুক্‌।……আমার সুম্মুন্দির—বুঝ্‌ছেন হুজুর—তিনখানা নাঙলের চাষ। ইয়া বড় বড় চার-পাঁচটা ধানের মরাই ঘরের উঠোনে। চার জোড়া চাষের বলদ,—বেটাদের শরীল্‌ কি হুজুর! কচুর চাষ করে' গেল-বছর চার শ' টাকা পেয়েছে আমার শালা—"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "বেশ, তাই কচুর চাষই কর্‌। গরুতে ছাগলে কচু খায় না বটে, কিন্তু যদি মানুষে খায়?"

শশী বলিল, "মাঠে কুঁড়ে বাঁধব হুজুর! এবার ত' পেছ্‌টান্‌ নাই, গায়ে আমার বাতাস লাগবে আজ্ঞে! আপদগুলোকে বিদেয় করে' এলাম ত' শুধু সেই জন্যেই।"

একটুখানি ভাবিয়া সীতাপতিবাবু বলিলেন, "জমি ত' ওখানে আমার অনেকখানাই আছে,—খানিকটা তুই

কর্, খানিক্‌টা আমি করি। লোকে চুরি করতে তাহ'লেও একটুখানি ভয় করবে।"

আনন্দে শশীর মুখ দিয়া আর কথাই বাহির হইল না।

গাছ কাটা তখন প্রায় শেষ হইয়াছিল, কাঁচিটা রাখিয়া দিয়া সীতাপতিবাবু বলিলেন, "চল্ জমিটা একবার দেখেই আসা যাক্।"

শশী প্রস্তুত হইয়াই ছিল, বলিল, "চলুন আজ্ঞে। কালই আমি তা'হলে একটা চিঠি লিখে দেব শালাকে। পোষ্টাপিস—নয়ান্‌কল্‌মি। জেলাটা কোন্ জেলা হবে তাহ'লে হুজুর?"

সীতাপতিবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "দেখে বলে' দেব। চল্।"

পথ চলিতে চলিতে শশী বলিল, "এসে' ত' দেখছি, গাঁয়ে খুব লালিশ-মকদ্দমা লেগে গেছে হুজুর,—আবার শুনছি নাকি আপনার সঙ্গেও—"

"হুঁা, আমার সঙ্গেও।"

শশী বলিল, "মরবার আগে পিঁপ্‌ড়ের ডানা বাঁধে আজ্ঞে, এইবার মরবে ঠিক। আর দেখুন, সেই যে

আমার আলু-পেঁয়াজ চুরি,—সে আর কারো কাজ নয় হুজুর,—ওই ওরাই।”

সন্ধ্যার ট্রেণে নবীন আর সেদিন আদালত হইতে ফিরিল না, বোধকরি রাত্রির ট্রেণে ফিরিবে।

লাঠি, কুড়ুল ও একটা তলোয়ার চৈতন ঠিক সময়েই হিঙ্গুলের তীরে প্রকাণ্ড শিমুলগাছটার পাশে বাসক-বোয়ানের ঝোপের তলায় আনিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু উঠাউঠি দুইটা ট্রেণ পার হইয়া গেল—নবীন আসিল না, গণেশ-কিশোরী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল।

মাটি ও গাছের কথা উঠিলে সীতাপতিবাবুর জ্ঞান থাকে না। হাতের উপর একমুঠা মাটি তুলিয়া লইয়া আঙ্গুল দিয়া গুঁড়া করিতে করিতে তখনও তিনি শশীকে বুঝাইতেছিলেন, “বীজ যদি পুষ্টলো হয়, আর একটুখানি সার-গোবর পড়ে এই মাটিতে,—বাস্, তা:’লে আর দেখ্‌তে হবে না, গাছকে ঠিক মাথা তুলে উঠ্‌তেই হবে—ফন্ ফন্

করে' ঠিক সাপের মত উঠ্‌বে, তেজ কি হবে গাছের! ……আসল কথা হচ্ছে, মাটিটাকে একটুখানি আদর-যত্ন করতে হবে। ভাল না বাসলে কেউ কিছুই দেয় না শশী, কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না…… মাটিই বা তোকে ফসলটি কেন দেবে বল্‌ দেখি, কেন দেবে সে?"

কথা কহিতে কহিতে হিঙ্গুলের উপর দিয়া তিনি বাড়ী ফিরিতেছিলেন।

নদীটি তখনও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই, এবং সেই সামান্য জলের উপর উভয় তীরের বড়-ছোট নানা-রকমের গাছের সারি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রকাণ্ড একটা শিরিশ গাছে বিস্তর ফুল ফুটিয়াছিল।

দূরে একটা গাছের আড়ালে তখন চাঁদ উঠিতেছে।

সীতাপতিবাবু সেইখানে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "নদীটা এইখানে বাঁধতে হবে শশী! আর এই শিরিশ গাছের তলায় চুয়ো খুঁড়ে' একটা টেঁড়া বাঁধ্‌লেই মাঠে জল যাবে—কি বলিস?"

ঘাড় নাড়িয়া শশী বলিল, "সে-সব আমি ঠিক করে' নেব হুজুর— !"

সীতাপতিবাবু গাছগুলার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। বলিলেন, "দাদার বুদ্ধি দেখ দেখি? বলে কিনা—হিজুলের গাছগুলো কেটে বিক্রি করে' ফেল ! তাই কাটে? তাই কাটে কখনও? কেটে দিলেই ত' সব ন্যাড়া বুঁচো হয়ে গেল—রইল কি? ছোট হোক, বড় হোক, মাটিতে যে একবার জম্মালো তাকে আর······কে! কে!······

পাশের একটা ঝোপের আড়াল হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া আসিল।

সীতাপতিবাবুকে দ্বিতীয় প্রশ্নের অবসর না দিয়াই গণেশ লাঠি চালাইল।

"লাগা তবে এই শালাকেই লাগা।"

কিশোরীও লাঠি তুলিল।

ডান হাতখানি তুলিয়া দিয়া সীতাপতিবাবু মাথা বাঁচাইলেন।

কিন্তু হাত ভাঙিল।

"ঈ—স্" বলিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

শশী তখন প্রাণপণে চীৎকার স্থরু করিয়াছে—

"ওরে মেরে ফেল্‌লে রে! কে আছিস্ রে! ডাকাত রে! ছুটে আয়! ছুটে আয়!"

গণেশ তাহাকে চুপ করাইবার জন্য দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে এক লাঠি মারিল, কিন্তু সে চুপ করিল না; মার খাইয়াও চেঁচাইতে লাগিল।

কিশোরীও তাহার উপর আর-এক লাঠি চালাইল।

কিন্তু তবু তাহার চীৎকার থামিল না।

তলোয়ারখানা হাতে লইয়া চৈতন আগাইয়া আসিতেই গণেশ বলিল, "চলে আয় বেটা, এগিয়ে আয়! এগিয়ে আয়!"

হাতিয়ার লইয়া চৈতন আগাইয়া আসিতেই গণেশ বলিল, "লাগা, এই চাষা-বেটাকেই আগে। শালা চেঁচায়।"

চৈতন চোট চালাইল।

শশীর পায়ের মাংস খানিকটা ঝুলিয়া পড়িতেই সে আরও জোরে চীৎকার স্থরু করিল।

গণেশ তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিল। বলিল, "লাগা এবার !"

কিশোরী চৈতন দুজনেই একসঙ্গে তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু চীৎকার তাহার ব্যর্থ হয় নাই। ষ্টেশন হইতে কতকগুলো লোক বোধকরি সেই পথ ধরিয়াই আসিতেছিল, হিঙ্গুলের ও-পারে সহসা তাহাদের হল্লা শুনিতে পাওয়া গেল।

আদালত হইতে সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নবীন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন যে হইবে তাহা সে কোন দিন ভাবিতেও পারে নাই।

সীতাপতিবাবু খাটের উপর শুইয়া ছিলেন। হাতে তাঁহার সেক দেওয়া চলিতেছিল। ডাক্তার আনিবার জন্য ষ্টেশনে লোক গিয়াছে। ফটিক শুধু শিয়রের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া একদৃষ্টে দাদুর মুখের পানে তাকাইয়া ছিল।

বাহিরে আর একটা খাটের উপর শশীর শুশ্রূষা চলিতেছে!

নবীনকে দেখিয়া সীতাপতিবাবু বলিয়া উঠিলেন, "শেষ পর্য্যন্ত এই হলো বাবা, বুড়ো বয়সে……"

গলাটা তাঁহার বন্ধ হইয়া আসিল। চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

নবীনের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। পাশের ঘরে তাহাদের পাশ-করা দো-নলা বন্দুকটি থাকিত। নবীন ঘরে ঢুকিয়া টোটা সমেত ধীরে-ধীরে তাহাই বাহির করিয়া আনিল।

বন্দুক দেখিয়া সীতাপতিবাবু চমকিয়া উঠিলেন।

"কি হবে, কি হবে, ও কি হবে কি?"

"কিছু হবে না।"—বলিয়া নবীন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

"নবীন!"

সীতাপতিবাবু বিছানা হইতে মাথা তুলিয়া একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—বালিশের

উপর মাথাটা তাঁহার আবার লুটাইয়া পড়িল। আবার ডাকিলেন—

"নবীন! নবীন!"

নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,

"গুলি করব। তাদের প্রত্যেককে খুন করব আজ—মেয়ে, ছেলে সব······।"

মাথা নাড়িয়া সীতাপতিবাবু ডাকিলেন,

"শোন্!......কাছে আয়।"

বহুকাল পরে এত বড় স্নেহের আহ্বান নবীন আজ আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"রাখ্······বন্দুক রাখ্। ছি—।"

নবীন বলিল, "কেন মিছে······আপনি জানেন না।"

সীতাপতিবাবু কহিলেন, "জানি। মানুষ খুন করার চেয়ে বড় পাপ আর দুনিয়ায় কিছু নেই······জানি। আমায় খুন করেছে......এর শাস্তি......ওদের ভগবান দেবেন।"

রাগে নবীনের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, নিজেকে সে আর সামলাইতে পারিল না, বলিল,

"ভগবান নেই !"

চওড়া বুকখানা তাহার ঘন-ঘন দুলিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু আবার তেমনি ধীর শান্তকণ্ঠে কহিলেন,

"আছেন......নবীন, বিশ্বাস কর্......আছেন।"

বলিয়াই তিনি একবার ঢোঁক গিলিয়া চোখ বুজিলেন।

একটুখানি থামিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,

"নালিশ-মোকদ্দমা যেমন চলছে চলুক। আমার ......আমার মনে হয়......তাও চালিয়ে কাজ নেই।"

নবীনের আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, বলিল, "এক্ষুনি চল্‌লাম।"

"কোথায় ?"

নবীন বলিল, "পুলিশ-সাহেবের কাছে। ওদের চালান্ দিতে হবে। 'এ্যারেষ্ট' করাতে হবে।"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "এইমাত্র এলি, আজ না বাবা—কাল যাস্।"

"না। এক্ষুনি—আজ রাত্রেই।......মহতাপ !"

দরজা খুলিয়া নবীন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত গ্রামের আবহাওয়া সে এক অত্যাশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে।

রাস্তার ধারে শিব-দেউলের সেই উঁচু রকের উপর নবীন সেদিন চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—হাতে একটা বেতের চাবুক। আজকাল এই চাবুকটা তাহার হাতেই থাকে। কাহারও সহিত বড়-একটা কথা কয় না।

কেনারাম মুখুজ্যে সেই পথ দিয়া কোথায় যাইতেছিল, নবীনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চোখ মিট্‌ মিট্‌ করিতে করিতে বলিল, "বসে আছ বাবা ?"

নবীন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "হুঁ।"

মুখুজ্যে বলিল, "টিকে-ওয়ালা এসেছে আমাদের গাঁয়ে। বলে, ছেলেবুড়ো সব টিকে নিতে হবে—শহরে বসন্ত হচ্ছে। আরে, শহরে বসন্ত হলো ত' আমাদের

কি? আমরা বলে নিজের জ্বালায় অস্থির,—টিকে নিচ্ছে! আর সে রকম টিকেই বা এখন পাবে কোথায়? সে সব বাংলা-টিকে—আমাদের আমলে ছিল। এই দ্যাখো—দাগ এখনও জ্বল্-জ্বল করছে, কাঠে আগুনে না হওয়া পর্য্যন্ত এ দাগ আর সহজে উঠ্ছে না বাবা!"

সে তাহার বাঁ হাতের উপর বসন্তের একটা টিকার দাগ নবীনকে দেখাইয়া দিল। বলিল,

"শুন্ছি নাকি ছেলেগুলোকে জোর করে ধরে-বেঁধে টিকে দিয়ে দিচ্ছে। কেন রে বাপু? এত ভাল তোর করে' কাজ কি? যার হবে তার হবে। কপালে যার আছে তার হবেই, টিকে দিলেও হবে না দিলেও হবে। —দেখা হলে তুমি একবার ওকে বারণ করে দিও ত বাবা! বলো, আমাদের গাঁয়ে টিকে কেউ নেবে না— তুমি যাও। ছেলেগুলো আমাদের ভয়ে মর্ছে, কাল থেকে একরকম ঘরেই পোরা রয়েছে—বেরোতে পায়নি, বুঝলে? তাতেও না যায়, আমি দিয়ে আসব এক নম্বর নালিশ করে ওর নামে,—জোর করে টিকে দেওয়া ওর বার করব।"

রাগের ঝোঁকে অবস্থা তাহার অত্যন্ত খারাপ হইয়া আসিল।

কেনারাম চলিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাল কথা। যে জন্যে এলাম সেই কাজটাই ভুলে যাচ্ছি।—আচ্ছা, উকীল মুক্তিয়াররা কি বলে? বেটাদের সাজা-টাজা কিছু হবে? জন্মের মতন ডিপ-চালান করে দেয়,—তবে ত জানি হ্যাঁ, হলো কিছু। দিনের পর দিনই ত শুধু পড়ছে, বেটারা বিচের-টিচের করতে জানে না, না কি!"

নবীন চুপ করিয়া রহিল।

কেনারাম আবার বলিল, "ও-সবের দফাটি একবারে নিকেশ করে' দেওয়াই ভাল, বুঝলে বাপ্। এতে পাপ নেই। দেবতার থানে পশু বধ করি আমরা—এও সেই পশু বধেরই সামিল।"

বিষণ দে পার হইয়া যাইতেছিল, নবীনকে দেখিয়া সেও একটি নমস্কার করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া পড়িল।

"বসে' আছেন আজ্ঞে?"

নবীন বলিল, "তোমার মনে আছে ত বিষণ? পরশু তোমার সাক্ষীর দিন আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে আমি দেয়ালের উপর গোবর দিয়ে ডাঁড়ি কেটে রেখেছি আজ্ঞে! আমার ছেলেই সব ইঞ্জিরি তারিখ টারিখের খবর রাখে,—যতই হোক্, পেটে দু-আখর পড়েছে ত,—না, কি বলেন মুখুজ্যে?—এই চারটি আম আনতে গিয়েছিলাম—দীনুর গাছে।"

বিষণ তাহার খাটো কাপড়ের খুঁটে বাঁধা আমগুলি দেখাইয়া বলিল, "কচি আমের গুড়-অম্বল খেতে বেশ, কিন্তু এ বচ্ছর কি আর খাওয়া হলো কিছু—এই হেঙ্গামা নিয়েই গেল। কচি নিমের পাতা ভেবেছিলাম খাব, কিন্তু আর হলো কই? সেদিন দেখি না আশু নাপিতের গাছের পাতাগুলি সব এরই মধ্যে বড় হয়ে গেছে। আর আমগুলো কি আর কচি আছে? এই দেখ না—আঁটি বেঁধে' গেছে এরই মধ্যে।"

কেনারাম তাহার ঝাপসা চোখের স্মুখে আমটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "আর না বাঁধে? গাছের ফলেরই বা দোষ কি? চোত পেরিয়ে

বোশেখে পড়তে চললো,—দেখতে-দেখতে কি রকম গরম পড়ে গেল দেখেছ ?……দাও, একটা যখন দিলে তখন আর দুটোই দাও! তরকারির সুখের ত' আর সীমে নেই,—গুড়-অম্বল আমারও হোক……"

বৈশাখ মাস ব্রাহ্মণ মাস।

গ্রামের ছোকরার দল খোল করতাল বাজাইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমস্ত গ্রামখানাকে মাতাইয়া তোলে,—গাঁয়ের পথে পথে সকলে মিলিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

অঘোর দালালের খোল করতাল সম্বৎসর ধরিয়া দেওয়ালের গায়ে টাঙানো থাকে, এই সময় ধূলা ঝাড়িয়া তাহাদের নামানো হয়। কিন্তু সে বৎসর দেওয়াল হইতে তাহারা আর নামিল না।

মনু পৈতণ্ডী তাহাকে সংকীর্ত্তনের কথা বলিতে গিয়াছিল। অঘোর বলে,

"দিনের বেলায় বিরেনো গাঁয়ে কাপড় বেচতে যেতাম তা-ই ছেড়ে দিলাম ;—এ ত' রাত ! ও-ই তোলা আছে, বাজাতে পার ত' নিয়ে যাও।"

সেদিন খঞ্জনিদার রাখু বোরেগী বলিল, "রাত-বিরেতে আমি আর বেরোই না দাদা ! সন্ধ্যে হলেই আমার ঘরে খিল পড়ে—তুমি না হয় দেখে' যেও একদিন।"

বেনোয়ারী ওস্তাদ তাহার এক মাসীর বাড়ীতে মাসাধিককাল বসিয়া আছে। লোকে জানে, যাত্রার দলে ঠিকা-চুক্তিতে এখনও তাহার বেহালা বাজানো চলিতেছে।

পাঁড়ে-পাড়ার পাশে পুরাণো একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় পাতাল-ফোঁড়্ পাথরের একটি শিব আছেন—ফণী-মনসা কাঁটার বেড়া দিয়া ঘেরা। বৈশাখের শেষ দিন, অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া, গ্রামের ছেলেবুড়া সকলকেই এই শিবের মাথায় এক ঘটি করিয়া জল ঢালিয়া বুড়া-বাবাকে ঠাণ্ডা করিয়া আসিতে হয়। না আসিলে গ্রামে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া ওঠে, আকাশে

মেঘগুলা মিছামিছি ঘুরিয়া বেড়ায়, মেঘে জল থাকে না, অনাবৃষ্টির দরুণ আবাদী জমিগুলি চাষের সময়েও শুকনো-ডাঙ্গার মত খাঁ খাঁ করিতে থাকে।

ঘরের কাছে পাইয়া গণেশ কিশোরী যে কাহাকেও বাদ দিবে না একথা ঠিক, অথচ বৈশাখের সংক্রান্তি আসন্নপ্রায়; নবীনের কাছে ঘন-ঘন লোকজনের আসা-যাওয়া স্বরু হইল।

নবীন বলিল, "আমি কি করব? দুর্ভিক্ষ হয় ত হোক্।"

আশু মুখুটী বলিলেন, "তোমার কি বাবা, অ-ঢেল টাকা-পয়সা, 'দুখ্-ভিক' হলে আমাদেরই সর্ব্বনাশ। তার চেয়ে আমি বলি কি, গাঁয়ে একটি ঢোল-সরহদ্দ করে' দাও—যে, সেদিন পূব্‌দিকে সুয্যিটি ঠিক লাল বরণ হবে, আর সব ঠিক একসঙ্গে—ছেলে বুড়ো সব ঠিক একই সময়ে—এক জোট হয়ে ঘড়ির ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ······বাস্! মার খায় ত খাবে সব একসঙ্গেই! আর এতগুলো লোক থাকব আমরা—মার কি অমনি মুখের কথা কিনা! মার যেন কত পড়ে থাকে পথের ধুলোয়!..."

নবীন কোনও কথাই বলিল না।

হাবু রায় কাছেই ছিল, বলিল, "আপনার মাথায় ত' এই বুদ্ধি হলো, আচ্ছা, আমি সব ঠিক করে' দিচ্ছি দেখুন —।" এবং ঠিক সে করিয়াও দিল।

সেই দিনই ষোল-আনা গ্রামের লোকের সহি লইয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের কাছে এই বলিয়া একটি আর্জ্জি পেশ্ করিয়া আসিল যে, আগামী বৈশাখ-সংক্রান্তির দিন গ্রামে তাহাদের একটি উৎসব আছে। উৎসবটি তাহাদের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের অনুষ্ঠিত, এবং সে উৎসবটি যাহাতে না হয়, গ্রামের দুষ্ট ব্যক্তি গণেশ ও কিশোরী পাঁড়ে ভিতরে-ভিতরে তাহারই আয়োজন করিয়াছে। তাহাদেরই দরজা দিয়া সেদিন সকলকে পার হইয়া যাইতে হইবে, সুতরাং গ্রামের মধ্যে ভীষণ একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অশান্তি-উপদ্রবের আশঙ্কা আমরা সকলেই করিতেছি। উক্ত দিবস হুজুর যদি সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারী দিয়া গ্রামের দরিদ্র প্রজামণ্ডলীকে সাহায্য না করেন তাহা হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ইত্যাদি।

সংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতেই মহকুমা

হইতে পাঁচজন বন্দুকধারী সিপাহী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালো রঙের মোটা চামড়ার বুটজুতাগুলা তাহাদের পায়ে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ করিয়া ডাকিতেছিল।

এবং সেই সিপাহী পরিবৃত হইয়া গ্রামের লোক নির্ব্বিঘ্নে সেদিন বুড়া-শিবের মাথায় জল ঢালিয়া আসিল।

ফিরিবার পথে পান্নু গাঙ্গুলী একজন সিপাহীর অত্যন্ত কাছ ঘেঁসিয়াই চলিতেছিল। গণেশ পাঁড়ের দরজার কাছাকাছি আসিয়া সিপাহীকে সে অত্যন্ত সন্তর্পণে অথচ জোরের সহিত কহিল, "ওটা কি তুমি আমাদের দেখাবার জন্যে এনেছ নাকি? দাও না, এইখানে ফুটিয়ে দাও না একটা, আওয়াজ হোক্, বেটা চম্‌কে' উঠুক্!...কি হে! তোমরা কোনও কাজেরই নও দেখছি যে!..."

যে কোন রকমেই হোক্, বুড়া-শিবের মাথায় জল সে-বৎসর অনেক পড়িল, কিন্তু তথাপি দরিদ্র গ্রামবাসীর উপর রাগ যে তাঁহার কেন পড়িল না কে জানে!

জ্যৈষ্ঠ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আকাশে মেঘ আছে, অথচ বৃষ্টি নাই।

গ্রামের অনেক পুকুর শুকাইয়া গেল। পানীয়ের অত্যন্ত অভাব। চারিদিক খাঁ খাঁ করে। দুপুরে আগুনের হল্‌কা বয়।

মাঝে-মাঝে যৎসামান্য যে বৃষ্টিটুকু হয়, মাঠে লাঙল দেওয়া দূরে থাকুক্‌—পথের ধুলাও তাহাতে ভিজে না।

সে বৎসর সকলকেই যে না খাইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে সে-আশঙ্কা অনেকেই করিতে লাগিল এবং ইহা যে শুধু এই হতভাগা পাঁড়েদের পাপের মাত্রা অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই—ইহাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল।

বৃষ্টি নামিল আষাঢ়ের প্রথমে। কিন্তু জলো-হাওয়ার আমেজ লাগিয়া হাকিমদের মাথাগুলাও ঠিক এই সময়েই সাফ্‌ হইয়া গেল। ঘন ঘন মোকদ্দমার দিন পড়িতে লাগিল।

ষষ্ঠী নিয়োগী সেদিন নবীনকে বলিল, "কাউকে কিছু ঘুষ্‌-টুষ্‌ দিয়ে মোকদ্দমার দিনগুলো এই সময় কিছু কম-

সম্ করে' ফেলাও ভায়া, একে নামি চাষ, তার উপর মাঠ-ঘাট যদি দেখতেই না পাওয়া গেল, তাহ'লেই ত' দফাটি আমাদের কাবার।"

নবীন বলিল, "জানি নে।—আমায় কেউ কিছু বল্‌তে এসো না ভাই এ-সময়, কারও কথা আমি রাখতে পারব না। মোকদ্দমা শেষ হোক্, তারপর যা হয় হবে।"

"শেষ হতে-হতেই যে···"

নবীন বলিল, "তোমাদের ভাল করতে গিয়েই আমার এই বিপদ। তোমাদের জন্যেই বুড়ো বাবাকে মার খাওয়ালাম···তোমাদের জন্যেই······" বলিতে বলিতে গলাটা তাহার ধরিয়া আসিল।

হরি মাইতি সেদিন তাহার কৃষাণকে সঙ্গে আনিয়া নবীনের কাছে আসিয়া পড়িল।

"দেখুন বাবু, কাজ দেখুন ব্যাটার! আদালতে সেদিন যাবার আগে এই বেটাকে বলে গেলাম, জমির রসে রসে এই সময় চাষ দিয়ে রাখিস্। বাস্! ফিরে এসে' দেখি, কোথাকার কি, কোথায় চাষ, কোথায় লাঙল—নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে বেটা! মাঠের 'বতর্' শুকিয়ে কাঠ

হয়ে গেছে হুজুর, আপনার দায়ে আমার সব গেল···এই লালিশ-মকদ্দমার জন্যে......”

হাতের বেতখানা তুলিয়া লইয়া নবীন লাফাইয়া উঠিল, “বেরো হারামজাদা, আমার স্মুখ থেকে বেরো—! যেতে হবে না তোকে আমার সাক্ষী দিতে, হারামজাদা, পাজি, ছুঁচো, ষ্টুপিড্! আমার দায়ে? চাষ গেল আমার দায়ে? গাধা, ষ্টুপিড্···”

নেপাল মুচির অসুখ গত কয়েকদিন হইতেই একটু-খানি বাড়িয়াছিল। আষাঢ়ের শেষাশেষি হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা কাশিতে কাশিতে মুখে রক্ত উঠিয়া সে মারা গেল।

তাহার মোকদ্দমার বিচার তখনও শেষ হয় নাই।

গ্রামের দুচারজন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, গণেশ যখন তাহাকে খামারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মারিতে-ছিল, সেও তখন গণেশকে দু’এক ঘা বসাইয়া দিতে কসুর

করে নাই, এবং হাজার হোক্, মুচি হইয়া ব্রাহ্মণকে মার,—ছ'মাস পার হইল না, মুখে রক্ত উঠিয়া শেষ হইয়া গেল...

এবং এই মারের ব্যাপারটা তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে; এতদিন কাহারও কাছে প্রকাশ করে নাই, নেপাল শুধু বাঁচিয়া ছিল বলিয়াই।

শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে আদালতে নেপালের মোকদ্দমা আবার উঠিল। নেপাল মুচি ও গণেশ পাঁড়ের ডাক হইল। নেপাল সে ডাক শুনিতে পাইল না, কিন্তু বিচার তাহার সেইদিনই শেষ হইয়া গেল। গণেশকে কুড়িদিন জেল খাটিতে হইবে......

সংবাদটা যখন গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল, নেপালের বৌ তখন দিন-আট-দশ জ্বরে ভুগিয়া সবেমাত্র সারিয়া উঠিয়াছে।

গণেশের জেলের খবর হরেকিষ্ট রাখহরির কাণে পৌঁছিতে দেরী হইল না, নবীনের কাছে তৎক্ষণাৎ তাহারা যেন হাওয়ার বেগে ছুটিয়া আসিল।

রাখহরি বলিল, "যাবে কোথা ভায়া, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। আমার বেলায় নাহয় ফস্কালে কোনরকমে, কিন্তু এবার—!"

হরেকিষ্ট সে কথা বলিল না। বলিল, "কুড়ি দিন—এমন আর কি বেশি হলো আজ্ঞে! দু'দুটো বাঘে খেয়ে এলে যায় ওর ওই হাতীর মত শরীর,—কুড়ি দিন ঘানি টেনে' কি আর এমন ঝট্‌কাবে হুজুর?......আচ্ছা হোক্, হোক্, ফিরে' ত' আস্‌বেই,—ফাঁকে যে আমি ওকে পাচ্ছি না কোনদিন······"

মহতাপ কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল।

নবীন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। বলিল, "ও।—আচ্ছা রাখহরি, তোমার ঘর থেকে শলিখানেক চাল আজ আমায় ধার দিতে পার? কাল-পরশু দিয়ে দেব।"

তৎক্ষণাৎ রাখহরি জবাব দিল, "ওইটি মাপ্ করবে ভায়া, থালা, ঘটি, বাটি, সাবল, কুড়ুল, কোদাল, ফাল, যা-কিছু চাও দিতে পারি, কিন্তু চা—ল ভায়া, চাষের অবস্থা ত' এবছর হটটম্বা, তার উপর ওই যে আমার বঙ্কিমানন্দ ভায়া, ওই যে ক্ষ্যাপা সেজে থাকেন, চাল-ধান সব বেচেখুচে' হুদ্দোফুটো ধরিয়ে দিলে···চাল কি হবে ভায়া? তোমার আবার চালের কি দরকার?"

হরেকিষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "দশ-বিশ সের চাল—এ ত' যেদিন খুশী...যখন খুশী...চাল আপনি কি কর্‌বেন আজ্ঞে ?"

নবীন সে কথার কোনও জবাব দিল না। মহতাপকে বলিল, "যাও, সজনী দত্তর দোকানে যাও, বুঝলে? আমার নাম করে' বল গিয়ে তাহ'লেই দেবে। তারপর নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এস ওর ঘরে। বলো যে তুই ভাবিস নে, কিচ্ছু ভাবনা নেই তোর।"

মহতাপ চলিয়া গেলে রাখহরি প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কে, কে, কাকে ভায়া কাকে ?"

নবীন অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে বলিল, "কাউকে না।"

বলিয়াই সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

কথাটাকে পাল্টাইয়া দিবার জন্য রাখহরি তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কুড়ি কুড়ি দিন মেয়াদ হলো ভায়া,—নেপা-বেটা বেঁচে থাকলে বেশ হতো কিন্তু..."

জেল হইতে ফিরিয়া গণেশ এবার খুব বেশি আস্ফালন করিতে পারিল না।

স্ত্রী বলিল, "চাল ধান টাকা পয়সা ঘরে আর একটি নেই—তুমি কয়েদ খাটো আর আমরা উপোস দিই।"

গণেশ বলিল, "তুই আমার বৌ-ই ন'স হারামজাদী, আমার কাছে বল্‌লি সে-ই ভাল, খবরদার আর-কারও কাছে বলিসনে এ কথা।"

গণেশকে আবার মদনপুরের তারিণীবাবুর কাছে ছুটিতে হইল। বাকি পনর বিঘা জমির মধ্যে দশ বিঘা আবার বন্ধক পড়িল।

নগদ পাঁচ-শ' টাকা হাতে পাইয়া গণেশ বলিল, "বড় মোকদ্দমাটা কেমন করে' ফাঁসিয়ে দিই এইবার তুই দ্যাখ্ বসে বসে।"

চৈতনের মা বলিল, "এ-বছর চাষ-টাষ কিছু হয়নি মনে থাকে যেন।"

গণেশ একটুখানি রসিকতা করিয়া তাহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিল যে, জেলখানার লপ্‌সি-ঘাঁটা তাহার পক্ষে অতি উপাদেয় খাদ্য, চাষ না হইলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই, এবং তাহারা জাত কন্নুজ্যে, চাষ-বাসের ভাবনা তাহারা ভাবে না।

ছোট-খাট মোকদ্দমাগুলির বিচার যখন শেষ হইল গ্রামের তিনটি দুর্গা প্রতিমায় তখন মাটি পড়িতেছে। পূজা সে-বৎসর কার্ত্তিকের প্রথমে।

সবগুলা জড়াইয়া গোটা-পঞ্চাশেক টাকা জরিমানা গণেশ আদালতে দাখিল করিয়া আসিল।

কিশোরী বলিল, "আমার জরিমানার টাকাটা দিলি না যে দাদা?"

গণেশের হাত তখন প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে, বলিল, "তোর টাকা তুই দিগে, না পারিস, জেল খেটে আয়, আমি খাটলাম কি করে?"

জবাব শুনিয়া কিশোরীর মনটা ভারি খারাপ হইয়া গেল, বলিল, "তোর সঙ্গে আর যদি কখনও কাজে নামি ত' এই—রাম, দুই, তিন।"

কিশোরী নিজের কাণ মলিয়া শপথ করিল।

গণেশ বলিল, "তোর বাপ নাম্‌বে, তোর হাড় নাম্‌বে। আমার হাতে এখনও বড় মোকদ্দমা সে খবর রাখিস্? তোর ট্যাঁকৃটেকে বৌ-শালীকে সম্বচ্ছর খেতে দিতে হবে —সে খবর রাখিস্?"

জরিমানার টাকা দিতে না পারিয়া দিন-কতকের জন্য কিশোরী জেলে গেল।

সীতাপতিবাবুর হাত-ভাঙ্গা মোকদ্দমাটার এজাহার জবানবন্দী প্রায়ই শেষ হইয়া আসিয়াছে, দু-পাঁচদিনের মধ্যেই যা-হোক্ একটা-কিছু হুকুম হইয়া যাইবে, এমন সময় গণেশ এক ভারি মজার ব্যাপার করিয়া বসিল।

হাতে টাকা নাই, অথচ বড় দরের একটা উকিল দিতে না পারিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না। বড় আদালতে গণেশ এই বলিয়া এক আর্জ্জি পেশ্ করিল যে, থানার পুলিশ-কনেষ্টবল হইতে আরম্ভ করিয়া মহকুমার বড় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব পর্য্যন্ত জমিদারের কাছে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘুষ খাইয়াছে, সুতরাং তাহার এই মোকদ্দমাটির

অন্যত্র বিচার না হইলে তাহার পক্ষে সুবিচারের আর কোনও আশা-ভরসাই নাই।

মোকদ্দমাটি দায়রা সোপরদ্দ হইয়া গেল।

দায়রায় তখন একটা ডাকাতি-মোকদ্দমার বিচার চলিতেছে। গণেশ দিনকতকের সময় পাইল।

পাঁচ বিঘা জমি মাত্র বাকি, তাহাও আবার ধীরেন ভট্চাজ্জের দেওয়া—সঙ্গে একটি ঠাকুর-সেবা আছে। ঠাকুর-সেবার কথাটা বেমালুম উড়াইয়া দিয়া গণেশ আবার তারিণীবাবুর কাছে গিয়া গড়াগড়ি দিয়া পড়িল।

—হুজুর না দিলে আর উপায় নাই। পাঁচ বিঘা নাথ্‌রাজ জমি, চার শ' টাকা তাহার চাই-ই। না দিলে মেয়ে-ছেলে লইয়া উপবাস দিয়া তাহাকে মরিতে হয়।

পূজার আগেই জুরির বিচার শেষ হইল।

...জমিদার সাধারণত অত্যাচারীই হইয়া থাকে... এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বড়-একটা হয় না। মোকদ্দমাটি আগাগোড়া জমিদারের সাজানো বলিয়াই বিশ্বাস, সুতরাং অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জুরিদের বিচারে আসামী তিনজন বেকসুর খালাস পাইল।

গণেশ, কিশোরী, চৈতন সেদিন আর পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিল না।

দূরের শহর হইতে ট্যাক্সি-মোটরগাড়ীটা জমিদারের দরজা দিয়া সশব্দে গ্রামে আসিয়া ঢুকিল, এবং তাহাদের বিজয়োল্লাসে সমস্ত গ্রামখানা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূজা আসিল।

লোকজন দেখিলেই হরি কোব্‌রেজের চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসে। বলে, "পিতিমে-পূজো এ-বছর আর হলো না দাদা, ঘট-পূজোই হোক্! পয়সা-কড়ির বড় টানাটানি।"

বঙ্কিমানন্দ বলে, "ও-বেটির পূজো না করাই উচিত। ওর সেই স্বামী-বেটাই হচ্ছে—বাবার বাবা তস্য বাবা!"

কপিল চক্কোত্তির আনন্দ আর ধরে না···বাঁশের কঞ্চি তাহার হাতেই থাকে। বলে, "কারও পড়া

হয়নি এ-বছর,—কার্ত্তিক, গণেশ, বাঘ, অসুর, লক্ষ্মী, সরস্বতী—কারও না! পূজোর ছুটিটা এম্‌নিই কাটালে,—পুরণো পড়া, হেণ্ড্‌-রাইটিং,—কিচ্ছু করেনি; সব মার খাবে, মারের চোটে ভূত ভাগিয়ে দেব আমি...”

বিজয়া দশমী···

প্রতিমা-বিসর্জ্জন কোন্‌ সময় হইয়া গেছে কে জানে!

বিসর্জ্জনের পর গ্রামের লোক ঘরে-ঘরে প্রণাম করিতে বাহির হয়। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে তাল-তেঁতুলের ছোট একটি বাগানের ভিতর, বহু প্রাচীন জরাজীর্ণ একটি মন্দিরে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রঙ্কিণীকে সকলেই প্রথমে প্রণাম করিয়া আসে।

নবীন উঠিল। সিদ্ধির নেশায় মাথাটা তখন তাহার অত্যন্ত ঘুরিতেছে।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।

গ্রামের পথে গোকুল চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। অত্যন্ত রোগা কঙ্কালসার এই লোকটি পড়াশ কোলে সামান্য একটি পাঠশালা করিয়া সংসার চালায়।

গোকুল বলিল, "এই যে ভায়া, এসো, কোলাকুলি করি।"

নবীন তাহার সেই শীর্ণ দেহটি সাগ্রহে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল।

গোকুল বলিল, "নাঃ, পেনাম করে' আর সুখ নেই ভায়া! মিঠাই-সন্দেশ দিতে হবে বলে' সব-বেটা দোরে খিল্ লাগিয়েছে। মোটে এই চার গণ্ডা পাওয়া গেল, আর এই খিলি-দুই পান। চললাম ভায়া, তোমার ঘরেই চল্‌লাম।"

"যাও।"—বলিয়া নবীন আগাইয়া গেল।

পথে আর কাহারও সাড়াশব্দ নাই। ঘরে-ঘরে খিল্ পড়িয়াছে সত্য। দু'পাশে আগাছার জঙ্গল। যেখানে-সেখানে ফণী-মনসার ঝোপ। ভাঙা প্রাচীর-ঘেরা পড়ো বাড়ীগুলা খাঁ খাঁ করিতেছে।

দূরে মনে হইল, গণেশ পাঁড়ের দরজা হইতে দুইটা

লোক বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা গেল…

"বেটার আছে কি যে খাওয়াবে?"

চাঁদের আলোয় তাহাদের চিনিতে পারিয়া নবীন একবার চমকিয়া উঠিল…রাখহরি ও হরেকিষ্ট।

নবীনকে দেখিতে পাইবামাত্র হরিপদ কামারের গোয়াল-ঘরের পাশে গা-ঢাকা দিয়া দুজনেই সরিয়া পড়িল।

নবীন সেইখান হইতেই ফিরিল। রুক্মিণীর মন্দির পর্য্যন্ত তাহার আর যাওয়া হইল না। মাথার ভিতরটা কেমন যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

ইস্কুলের বিদেশী-পণ্ডিতটি পূজার ছুটিতে বাড়ী গিয়াছেন। তাঁহারই সেই পরিত্যক্ত ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া নবীন চুপ করিয়া বসিল।

খোলা জানালার পথে ঘরের ভিতর চমৎকার জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে।

দূরের বাউরী-পাড়ায় মাদল বাজাইয়া গান চলিতেছিল। হরি কোবরেজের ঘর হইতে হামান্‌দিস্তায় পান-ছেঁচার শব্দ আসিতেছে। পাশেই হিমি-বুড়ীর

উঠানে প্রকাণ্ড একটা বাঁশের মাথায় ছোট একটা আকাশ-প্রদীপ ঝুলিতেছে।

নবীন এই প্রদীপটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। চোখ দুইটা তাহার বন্ধ হইয়া আসিতেছে। মাথার ভিতরটা ঝিম্‌-ঝিম্ করিতেছিল।

...মনে হইল, প্রদীপটা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাহিরে বাঁশের বাকারি ও রঙিন কাগজের আবরণটা পুড়িয়া গেল! সঙ্গে-সঙ্গে বাঁশের মাথাটাও জ্বলিতেছে...

নবীন সেদিক হইতে মুখ ফিরাইল।

সুমুখে একটা বই-এর আলমারি। তাহার মাথার উপর রঙিন একটা গোলাকার 'গ্লোব্'।

এই গ্লোবখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া স্কুলের ছেলেদের সে অনেকবার বুঝাইয়াছে—আমেরিকা...ইয়োরোপ ...এসিয়া...

তাহাদের এই ছোট গ্রামখানি নবীন মনে-মনে খুঁজিতে লাগিল। মনে হইল, গ্লোবটা বোঁ বোঁ করিয়া

ঘুরিতেছে। সমস্ত দেশ, মহাদেশ, গ্রাম, নগর—মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল…

আকাশ-প্রদীপের আগুন না জানি কখন আসিয়া বই-এর আলমারিতে লাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই আগুন গ্লোবে গিয়া লাগিল।

…গ্লোব পুড়িতেছে…।

নবীন আর সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সুমুখের টেবিলের উপর মাথাটা তাহার এলাইয়া পড়িল।

…পুড়ুক্! আর-একটা নূতন গ্লোব আনিয়া দিব।

